নগরপাল বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র ও

শ্রীযুক্তা নীলিমা দত্তের

চতুর্ভুজচরণে

বোলপুর

ফাল্গুন, ১৩৭৮

—সৈয়দ মুজতবা আলী

নিবেদন

এই সঙ্কলনের কোনো কোনো প্রবন্ধে পুনরাবৃত্তি দোষ একাধিকবার ঘটেছে। তার প্রধান কারণ, তাবৎ প্রবন্ধ একই সময় পরপর লেখা হয়নি। ফলে কোনো প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বহু বৎসর পরে লিখিত অন্য প্রবন্ধের পটভূমি নির্মাণে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, আমার যাবতীয় প্রবন্ধের তাবৎ বিষয়বস্তু পাঠকমাত্রই স্মরণে রেখে পরবর্তী প্রবন্ধ পড়বেন, এ হেন দুরাশা আমার মত নগণ্য লেখক করতে পারে না। এমতাবস্থায় স্মৃতিধর পাঠকের কাছে অধম কিঞ্চিৎ ক্ষমাভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কথাটি না বললে সত্য গোপন করা হবে যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশতঃ অহেতুক পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে যার জন্য আমি কোন প্রকারের ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি না। তবে ভরসা রাখি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে, যতখানি সম্ভব, পুনরাবৃত্তি ভ্রমের সংশোধন করে নিতে পারবো॥

—বিনীত

মুজ্‌তবা আলী

সূচী

বড়বাবু	...	৩
রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ	...	২৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	৪২
সরলাবালা	...	৪৬
হাসনুহানা	...	৫০
বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি	...	৫৬
পরিচিতি	...	৬৮
হতভাগ্য কাছাড়	...	৭৪
নেতাজী	...	৮০
মস্কো যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়	...	৮৫
কুটি	...	৯৫
দরখাস্ত	...	১০৫
সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার	...	১১১
অপর্ণার পারণা বা স্যালাড	...	১৪৯
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়	...	১৫৫
রাষ্ট্রভাষা	...	১৬৫
বদ্ধ-বাতায়নে	...	১৮৫
এ্যারোপ্লেন	...	১৯৪
চরিত্র-বিচার	...	২০৮
গান্ধীজীর দেশে ফেরা	...	২১৩
তপঃ-শাস্ত	...	২১৮
মৃত্যু	...	২২০

বড়বাবু

বড়বাবু

॥ অবতরণিকা ॥

প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে; পিতার চেয়ে তেইশ বছরের ছোট এবং তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতার বয়স চৌদ্দ। কনিষ্ঠতম ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে একুশ, বাইশ বছরের ছোট।

আমি এ জীবনে দুটি মুক্ত পুরুষ দেখেছি; তাঁর একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

এঁর জীবন সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানবার উপায় নেই। তার সরল কারণ, তাঁর জীবনে কিছুই ঘটেনি। যৌবনারম্ভে বিয়ে করেন, তাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। যৌবনেই তিনি বিগতদার হন। পুনর্বার দারগ্রহণ করেননি।[১] চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ এ দেশে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের স্থায়ী কীর্তিও বাঙালী পাঠক ভুলে গিয়েছে।

দ্বারকানাথ যে যুগে বিলেত যান সে-সময় অল্প লোকই আপন প্রদেশ থেকে বেরত। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তো প্রায়শ বাড়ির বাইরে বাইরে কাটাতেন। (ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই)। তাই স্বতই প্রশ্ন জাগবে, ইনি কতখানি ভ্রমণ করেছিলেন।

একদা কে যেন বলেছিল, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই লিখে দিলেন:

১ এ তথ্যগুলো প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকে নেওয়া।

ইচ্ছা সম্যক জগদরশনে[২] কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি !
টঙ্কা-দেবী করে যদি কৃপা না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না শুধু ভস্মে ঘি ঢালা ॥[৩]

২ আমি 'ভ্রমণগমনে' পাঠও শুনেছি। কিন্তু স্পষ্টত 'জ' অক্ষর 'ভ্র'-র চেয়ে ভালো।

এই কবিতাটির আর একটি পাঠ আমি পেয়েছি। কোনটা আগের কোনটা পরের বলা কঠিন। মনে হয় নিম্নলিখিতটাই আগের। এটি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত :

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।

'টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা ॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি ॥'

৩ এর থেকে কিছুটা উৎসাহ পেয়েই বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ রচেন 'পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল,—'। চতুষ্পদীটি আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে উদ্ধৃত করছি বলে ছন্দপতন বিচিত্র নয়। সংস্কৃত কাব্যের আদি ও মধ্যযুগে মিল থাকতো না (মিল জিনিসটাই আর্য ভাষা গোষ্ঠির কাছে অর্ধপরিচিত। পক্ষান্তরে সেমিতী আরবী ভাষাতে মিলের ছড়াছড়ি। মিলের সংস্কৃত 'অন্ত্যানুপ্রাস' শব্দটিই কেমন যেন গায়ের জোরে তৈরী বলে মনে হয়। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।)

চারটি ছত্রের চারটি তথ্যই ঠাট্টা করে লেখা। কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) বেড়াবার শখ ছিল। বরঞ্চ শুনেছি, তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা আছে কি না, শুধিয়ে পাঠান এবং তিনি অনিচ্ছা জানান। 'পাথেয় নাস্তি' কথাটারও কোনো অর্থ হয় না ; দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলের টাকা ছিল না, কিংবা কর্তা গত হওয়ার পরও হাতে টাকা আসেনি, এটা অবিশ্বাস্য।

আমার সামনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি তা হলে নিবেদন করি। ১৩৩১-এর ১লা বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের উপাসনা সমাপন করে যথারীতি সর্ব জ্যেষ্ঠের পদধূলি নিতে যান। সেবারে ঐ ১লা বৈশাখেই বোঝা গিয়েছিল, বাকি বৈশাখ এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত কি রকম উৎকট গরম পড়বে। প্রেসের পাশের তখনকার দিনের সব চেয়ে বড় কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়ে প্রায় শেষ হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বাগ্রজকে বললেন যে, এবারে গরম বেশী পড়বে বলে তিনি হিমালয়ের 'ঘুমে' বাড়ি ভাড়া করেছেন, 'বড়দাদা' গেলে ভালো হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বড়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'আমি ? আমি আমার এই ঘর-সংসার নিয়ে যাবো কোথায় ?' যে-সব গুরুজন আর ছেলেরা গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়া করেছিলেন। হয়তো বা মুখ টিপে হেসেও ছিলেন। তাঁর ঘর-সংসার ! ছিল তো সবে মাত্র দু-একটি কলম, বাক্স বানাবার জন্য কিছু পুরু কাগজ, দু'একখানা খাতা, কিছু পুরনো আসবাব ! একে বলে ঘর-সংসার ! এবং তার প্রতি তাঁর মায়া ! 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক স্মরণে আনতে পারবেন, নিজের রচনা, কবিতার প্রতিই তাঁর কী চরম ঔদাসীন্য

ছিল ![4] লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও।' প্রাচীন যুগের দামী কাশ্মিরী শাল। হয়তো বা দ্বারকানাথের আমলের। কারণ তাঁর শালে শখ ছিল। ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি। শেষটায় যখন বড়বাবুর চাকর দেখে, বাবুর উরুর উপর শালখানা নেই, সে নাতি দিনেন্দ্রনাথকে (রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভাণ্ডারি') খবর দেয়। তিনি বোলপুরে লোক পাঠিয়ে শালখানা 'কিনিয়ে' ফেরত আনান। ভিখিরি নাকি খুশী হয়েই 'বিক্রী' করে ; কারণ এ-রকম দামী শাল সবাই চোরাই বলেই সন্দেহ করতো। কথিত আছে, পরের দিন যখন সেই শালই তাঁর উরুর উপর রাখা হয় তখন তিনি সেটি লক্ষ্যই করলেন না, যে এটা আবার এল কি করে !

আবার কবিতাটিতে ফিরে যাই। 'পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু' —আর যার সম্বন্ধে খাটে খাটুক, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না। এ রকম সদানন্দ, শান্ত-প্রশান্ত, কণামত্র অজুহাত পেলে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত মানুষ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। আমার কথা বাদ দিন। তাঁর সম্বন্ধে বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ যা লিখে গেছেন সেই যথেষ্ট। কিংবা শ্রীযুত নন্দলালকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

৪ 'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।'—জীবনস্মৃতি।

'টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা'—ও বিষয়ে তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন।

আর সবচেয়ে মারাত্মক শেষ ছত্রটি। তাঁর 'বিদ্যাবুদ্ধি' 'কিছু না কিছু না' বললে কার যে ছিল, কার যে আছে সেটা জানবার আমার বাসনা আছে। অবশ্য সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর একটি কাণাকড়িমাত্রও ছিল না। কিন্তু সে অর্থে আমি নেব কেন? 'বুদ্ধি' বলতে সাংখ্য দর্শনে যে অর্থে আছে সেই অর্থেই নিচ্ছি—যে গুণ প্রকৃতির রজঃ তম গুণের জড়পাশ ছিন্ন করে জীবকে 'পুরুষের' উপলব্ধি লাভ করতে নিয়ে যায়।[৫] তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি, রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বলেন, তিনি জীবনে দুটি পণ্ডিত দেখেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর বড়দাদা; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত ইয়োরোপীয় অর্থে। তাঁর বড়দাদা কোন্ অর্থে কবি সেটি বলেননি। এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা যেন না ভাবি তাঁর বড়দাদা বলে তিনি একথা বললেন।

বর্তমান লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি উভয়ই অতিশয় সীমাবদ্ধ। তবে আমারই মত অজ্ঞ একাধিকজনের জানবার বাসনা জাগতে পারে আমি কাদের পণ্ডিত বলে মনে করি। আমি দেখেছি দুজন পণ্ডিতকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইয়োরোপবাসের পরও।

অনেকের সম্বন্ধেই বেখেয়ালে বলা হয়, অমুকের বহুমুখী প্রতিভা

৫ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কৈবল্য লাভের পর এটিও থাকে না। গীতাতে আছে, 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ / অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥' ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) এ প্রকৃতি অপরাপ্রকৃতি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে কৈবল্য লাভে 'বুদ্ধির' কতখানি প্রয়োজন সেটি এস্থলে না বলে পাঠককে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত, পঞ্চম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠার বরাত দিচ্ছি।

ছিল। আমি বলি সত্যকার বহুমুখী প্রতিভা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই চর্চা করেছেন তিনি সমস্ত জীবন ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গণিতচর্চা বিদেশে প্রকাশিত করার জন্য উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু 'বড়দাদা' বিশেষ গা করেন নি।[৬] এদেশের অত্যল্প লোকই এ যাবত গ্রীকলাতিনের প্রতি মনোযোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রীকলাতিনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে শব্দতত্ত্বে সংস্কৃত উপসর্গ, তথা মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ রচনা অতুলনীয়। কঠিন, অতিশয় কঠিন—পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, এরকম কঠিন জিনিস এর চেয়ে সরল করে স্বয়ং সরস্বতীও লিখতে পারতেন না।

আমার যতদূর জানা, খাঁটি ভারতীয় পণ্ডিতের ন্যায় ইতিহাসকে তিনি অত্যধিক মূল্য দিতেন না—ইতিহাস 'পের সে', বাই ইট্‌সেলফ্‌। অথচ পরিপূর্ণ অনুরাগ ছিল 'ইতিহাসের দর্শন'-এর (ফিলসফি অব হিস্ট্রির) প্রতি।

সাহিত্য ও কাব্যে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বিশেষ বয়সে তিনি খাঁটি কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু দর্শন ছাড়া যে কোনো বিষয় রচনা করতে হলে (যেমন শব্দতত্ত্ব বা রেখাক্ষর বর্ণমালা অর্থাৎ 'বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড') মিল, ছন্দ ব্যবহার করে কবিতারূপেই প্রকাশ করতেন। বস্তুত কঠিন দর্শনের বাদানুবাদ ভিন্ন অন্য যে কোনো ভাবানুভূতি তাঁর হৃদয়মনে সঞ্চারিত হলেই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া

---

৬ দ্বিজেন্দ্রনাথের এক আত্মীয়ের (ইনি রবীন্দ্র সদনে কাজ করেন) মুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন বলেন, 'এ সব কাজ তুই করছিস কেন? যার দরকার সে অনুবাদ করিয়ে নেবে। তুই তোর আপন কাজ করে যা না।'

হত সেটি কবিতাতে প্রকাশ করার। এবং তাতে যদি হাস্যরসের কণামাত্র উপস্থিতি থাকতো, তাহলে তো আর কথাই নেই।

নিচের একটি সামান্য উদাহরণ নিন :

তাঁরই নামে নাম, অধুনা অর্ধবিস্মৃত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (বরঞ্চ ডি. এল. রায় বললে আজকের দিনের লোক হয়তো তাঁকে চিনলে চিনতেও পারে) 'একদা তদীয় গণ্যমান্য বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু বন্ধু-বান্ধবকে একটা বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে আহ্বান-লিপি 'জারি' হইয়াছিল তাহা এ স্থলে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিতেছি।—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ—এ হেন যে আপনি, আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশ-নয়না ভামিনী-সমভিব্যহারে (sic), আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি,

শ্রীসুরবালা দেবী।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"[৭]

এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন,

'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্ম-
বিনিন্দিত পদযুগ মে।

---

৭ দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩২০।

আছে সত্যি পদরজরত্তি,—তাও পবিত্র
কে জানিত মে
চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি,
অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু—
মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্নে যদি গুরু
বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা (sic) যগুপি সহসা চুপিচুপি
প্রেরিত না হই পরধামে॥'[৮]

গুরুজনদের মুখে এখানে শুনেছি যে সময় তিনি এই মিশ্র সংস্কৃতে নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তর দেন তখন তিনি গীতগোবিন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন বলে ঐ ভাষাই ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলেন, জয়দেবই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার কাঠামো তৈরী করে দিয়ে যান। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তরও শেষের দিকটি বাঙলায়। আবার কোনো কোনো গুরুজন দ্বিতীয় ছত্রটি পড়েন, 'ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্মপলাশলোচনভামিনী মে।'

কবিতাতে সব-কিছু প্রকাশ করার আরো দুটি মধুর দৃষ্টান্ত দি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষেধ ছিল। একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতর্ভ্রমণের সময় দূর হতে দেখতে

৮ যদিও দেবকুমার মহাশয় লিখেছেন তিনি এগুলো 'অবিকল মুদ্রিত' করে দিয়েছেন, তবু আমার মনে ধোঁকা আছে যে তার নকলনবীস কোনো কোনো স্থলে ভুল করেছেন। এমনকি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রয়েছে সেটিতে 'চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি' স্থলে 'চৌদ্দপুরুষাবধি ত্রাণ পায় যদি' কে যেন মার্জিনে পাঠান্তর প্রস্তাব করছেন, হস্তাক্ষরে। তাই বোধ করি হবে। কারণ প্রতি ছত্রে ভিতরের মিল, যথা 'সম্পত্তির' সঙ্গে 'বৃহস্পতি', 'কানন'-এর সঙ্গে 'বাহন', 'সত্যি'-র সঙ্গে 'রত্তি' রয়েছে। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের এ সব রসরচনা কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে শুদ্ধপাঠ যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।

পান, হেডমাস্টার জগদানন্দ রায় একটি ছেলের কান আচ্ছা করে কষে দিচ্ছেন। কুটিরে ফিরে এসেই তাঁকে লিখে পাঠালেন ঃ

'শোনো হে, জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা—'

'গাধা পিটলে ঘোড়া হয় না'—এটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু 'ঘোড়াকে পিটলে সেটা গাধা হয়ে যায়' এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অবদান'। এর সঙ্গে আবার কেউ কেউ যোগ দিতেন,

'শোনো হে জগদানন্দ,
তুমি কি অন্ধ !'

এটির লিখিত পাঠ নেই। তাই নির্ভয়ে উদ্ধৃত করলুম। এর পরেরটি কিন্তু ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে বেরিয়েছে। এর মধ্যে ভুল থাকলে গবেষক সেটি অনায়াসে মেরামত করে নিতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের ৬৫ বৎসর বয়স হলে তিনি ভোরবেলা চিরকুটে লিখে পাঠালেন ঃ

চমৎকার না চমৎকার !
সেই সেদিনের বালক দেখো,
পঞ্চষট্টি হল পার।
কাণ্ডখানা চমৎকার,
চমৎকার না চমৎকার !

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ততদিন কলকাতাতেই ছিলেন। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজের চক্রবর্তী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম (তিনি ধর্মের স্মৃতি শাস্ত্রটুকু ব্যবহার করেছেন মাত্র ; মোক্ষপথ-নির্দেশক ধর্ম ও দর্শনে তাঁর

বিশেষ অনুরাগ ছিল না) ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন না বলে সে যুগের অন্যতম চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের নিত্যালাপী—প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে যেতেন।[৯] ঐ সময় বঙ্কিমের বিরুদ্ধ-আলোচনা হলে পর তাঁর কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ফলে, এঁর মধ্যে একজন ঠাকুরবাড়িতে কাজ করতেন বলে বঙ্কিম লেখেন, 'শুনিয়াছি ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নায়েব কি কি আমি ঠিক জানি না।' অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন—আমার মনে হয় অনিচ্ছায়—বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন বঙ্কিম গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামা একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া (বঙ্কিমের রচনাটি ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হচ্ছিল—লেখক) তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন,[১০] তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর

৯ ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমে তখন যে বাদ-বিবাদ হয় সে সময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম লেখেন, '১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক বার রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে।' (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৯১৬/৭।) বলাবাহুল্য বঙ্কিম যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

১০ বস্তুত তখন বাঙলা দেশে প্রচলিত ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর ও 'কোঁৎ-এর শিষ্য' বঙ্কিমের ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ় নয়।

(অর্থাৎ যাঁরা বঙ্কিমের প্রতিবাদ করেন, 'নগণ্য' অর্থে নয়—লেখক) ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ব-বোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

আমি জানি আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, তাই আমি এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার উল্লেখ করলুম। বস্তুত বাঙলা দেশের এই উনবিংশ শতকের শেষের দিক (ফ্যাঁ দ্য সিএক্‌ল্) যে কী অদ্ভুত রত্নগর্ভা তা আজকের দিনের অবস্থা দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

আমি সে আলোচনা এস্থলে করতে চাইনে। আমি শুধু নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বান্বেষী তাঁদের দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় এক বৎসর তাঁর সখা সিংহ পরিবারের সঙ্গে রাইপুরে কাটান। তার পর ১৯০৭-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতন আশ্রমের বাইরে (এখন রীতিমত ভিতরে) এসে আমৃত্যু (১৯২৬) বসবাস করেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে তিনজন লোক তাঁর নিত্যালাপী ছিলেন, স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও রেভরেণ্ড এণ্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভুলে যেতেন যে রবীন্দ্রনাথের বয়সও ষাট পেরিয়ে গেছে (আমি শেষের পাঁচ বৎসরের কথা বলছি—স্বচক্ষে যা দেখেছি) এবং শাস্ত্রী-মশাই যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো নূতন লেখা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলতেন, 'এটি গুরুদেবকে দেখাতেই হবে,' তখন তিনি প্রথমটায় বুঝতেনই না, 'গুরুদেব' কে, এবং অবশেষে বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে বলতেন, 'রবি? রবি তো ছেলেমানুষ! সে এসব বুঝবে কি?' ভুলে

যেতেন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন• রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আবার পর দিনই হয়তো বাঙলা ডিফথং সম্বন্ধে কবিতায় একটি প্রবন্ধ (!) লিখে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথকে। চিরকুটে প্রশ্ন, 'কি রকম হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতেন সেটি পাঠক খুঁজে দেখে নেবেন।

শিশুর মত সরল এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যুগে যে কত লেজেণ্ড প্রচলিত ছিল তার অনেকখানি এখনো বলতে পারবেন শ্রীযুত গোস্বামী নিত্যানন্দ বিনোদ, আচার্য নন্দলাল, আচার্য সুরেন কর, বন্ধুবর বিনোদবিহারী, অনুজপ্রতিম শান্তিদেব, উপাচার্য সুধীরঞ্জন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দীপেন্দ্রনাথ তাঁরই জীবদ্দশায় গত হলে পর তিনি নাকি চিন্তাতুর হয়ে পুত্রের এক সখাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তা দীপু, উইল-টুইল ঠিকমতো করে গেছেন তো?' এ গল্পটি বলেন শ্রীযুত সুধাকান্ত ও উপাচার্য শ্রীযুত সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জন চীফ-জাস্টিস ছিলেন বলে আইনের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'দুশ্চিন্তা' স্বতই তাঁর মনে কৌতুকের সৃষ্টি করে—এবং গল্পটি বলার পর তিনি বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে চোখের ঠার মানেন।

তাঁর অকপট সরলতা নিয়ে যে-সব লেজেণ্ড (পুরাণ) প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে একাধিক আশ্রমবাসী একাধিক রসরচনা প্রকাশ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামান্য। একবার আমার হাতে একটি সুন্দর মলাটের খাতা দেখে শুধোলেন, 'এটা কোথায় কিনলে?' আমি বললুম, 'কোপে'। 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'কো-অপারেটিভ স্টোর্সে।' তিনি উচ্চহাস্য[১১] (এ উচ্চহাস্য কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত হত এবং প্রবাদ আছে

[১১] তিনি একাধিকবার গীতা থেকে, 'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে' 'প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্যবস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়', ছত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

'দেহলীতে' বসে গুরুদেব তাই শুনে মৃদুহাস্য করতেন) করে বললেন, 'ও! তাই নাকি! তা কত দাম নিলে?' আমি বললুম, 'সাড়ে পাঁচ আনা।' আমি চলে আসবার সময় একখানা চিরকুট আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'বউমা (কিংবা ঐ ধরনের সম্বোধন), আমাকে তুমি (কিংবা 'আপনি', তিনি কখন কাকে 'আপনি' কখন 'তুমি' বলতেন তার ঠিক থাকতো না—'তুই' বলতে বড় একটা শুনিনি) সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা দিলে আমি একখানা খাতা কিনি।' তাঁর পুত্রবধূ তখন বোধহয় দু' একদিনের জন্য উত্তরায়ণ গিয়েছিলেন।

তাঁর এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, একবার বাম্পার্-ক্রপ্ হলে পর সুযোগ বুঝে পিতা মহর্ষিদেব তাঁকে খাজনা তুলতে গ্রামাঞ্চলে পাঠান। গ্রামের দুরবস্থা দেখে তিনি নাকি তার করলেন, 'সেণ্ড ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড'। (তাঁর 'গ্রামোন্নয়ন' করার বোধহয় বাসনা হয়েছিল)। উত্তর গেল 'কাম্ ব্যাক!'

* * *

তাঁর সাহিত্যচর্চা, বিশেষতঃ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য কাব্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে অত্যুত্তম আলোচনা করেছেন। বস্তুত তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেননি বলে বঙ্গজন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভালো হয়।

আশ্চর্য বোধ হয়, এই সাতিশয় অন্-প্র্যাকটিক্যাল, অব্যবসায়ী লোকটি কেন যে বাঙলায় 'শর্টহ্যাণ্ড' প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় তো একাধিকবার গেলই, তদুপরি আগাগোড়া বইখানা—দু' দু'বার—ব্লকে ছাপাতে হয়েছে, কারণ তিনি যেসব সাঙ্কেতিক চিহ্ন (সিম্‌ব্‌ল্) আবিষ্কার করে ব্যবহার করেছেন সেগুলো প্রেসে থাকার কথা নয়। তদুপরি

মাঝে মাঝে পাখী, মানুষের মুখ, এসবের ছবিও তিনি আপন হাতে এঁকে দিয়েছেন।

প্রথমবারের প্রচেষ্টা পুস্তকাকারে প্রকাশের[১২] বহু পরে তিনি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেন। তার প্রাক্কালে তিনি ৺বিধুশেখরকে যে পত্র দেন সেটি প্রথম (কিংবা দ্বিতীয়) প্রচেষ্টার পুস্তকের ভিতর একখানি চিরকুটে আমি পেয়েছি। তাতে লেখা,

'শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি বহু পূর্বে হোল্‌দে কাগজে রেখাক্ষর স্বহস্তে ছাপাইয়াছিলাম[১৩]—লাইব্রেরীতে তাহার গোটাচার-পাঁচ কপি আছে। তাহার একখানি পাঠাইয়া দিন্।' নীচে স্বাক্ষর নেই। শুনেছি, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন। প্রথমখানির সঙ্গে দ্বিতীয়-খানি মিলালেই ধরা পড়ে যে তিনি এবারে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন করে বইখানা লিখলেন। এটির প্রকাশ ১৩১৯ সনে।

এবং বই দুইখানি না দেখা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবেন না, যে, শর্টহ্যাণ্ডের মত রসকশহীন বিষয়বস্তু তিনি আগাগোড়া লিখেছেন পদ্যে—নানাবিধ ছন্দ ব্যবহার করে।

প্রথমেই তিনি লেগেছেন বাঙলার অক্ষর কমাতে ; লিখছেন,

রেখাক্ষর বর্ণমালা
প্রথম ভাগ ॥
বত্রিশ সিংহাসন।
বাঙলা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা।
অদ্‌ভুত নূতন সব কাণ্ড কারখানা ॥

১২, ১৩ এ-পুস্তক বোধ হয় কখনো সাধারণে প্রকাশ হয়নি। প্রাইভেট সার্কুলেশনের জন্য ছিল। তার অন্যতম কারণ তাতে প্রকাশক বা প্রকাশ-স্থানের নাম নেই। এবং লেখক বলছেন, তিনি 'স্বহস্তে' ছাপিয়েছিলেন।

য-য়ে শূন্য, ড-য়ে শূন্য, শূন্য পালে পাল।
দেব নাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল॥
য যবে জমকি বসে শবদের মুড়া।
জ বলে সবাই তারে—কি ছেলে কি বুড়া॥
মাজায় কিম্বা ল্যাজায় নিবসে যখন
ইয় উচ্চারণ তার কে করে বারণ॥
ময়ুর ময়ূর বই মজুর তো নয়!
উদয় উদজ নহে, উদয় উদয়॥

এর পর তাঁর বক্তব্য ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তিনি ড ঢ ও ড় ঢ় নিয়ে পড়লেন ঃ

কেন এ ঘোড়ার ডিম ড-য়ের তলায়?
বুঢ়াটাও ডিম পাড়ে! বাঁচিনে জ্বালায়!
একি দেখি! বাঙ্গালার বর্ণমালা যত
সকলেই আমা সনে লঢ়িতে উদ্যত!
ব্যাকরণ না জানিয়া অকারণ লঢ়।
শবদের অন্তে মাঝে ড ঢ-ই তো ড় ঢ়॥

দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাপারটি তিনি আরো সংক্ষেপে সারছেন ঃ

শূন্যের শূন্যত্ব।

শবদের অন্তে মাঝে বসে যবে সুখে
বেরো'য় য়-ড়-ঢ় বুলি য-ড-ঢ'র মুখে॥
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নীচে?
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে!
নীচের ছত্তর চারি চেঁচাইয়া পড়—
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড়॥

পাঠ

আষাঢে ঢাকিল নভ পযোধর-জালে।
বাযস উডিযা বসে ডালের আডালে ॥
ঘনরবে মযূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিযা খডম জোডা ঢুকিলাম ঘরে ॥

একেই বোধ হয় গ্রীক অলঙ্কারের অনুকরণে ইংরাজিতে 'বেথস্' বলা হয়। প্রথম তিন লাইনে নৈসর্গিক বর্ণনার মায়াজাল নির্মাণ করে হঠাৎ খড়ম-জোড়ার মুদ্গর দিয়ে আলঙ্কারিক মোহ-মুদ্গর নির্মাণ।

ছন্দ মিল ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস—কবিতা রচনার যে কটি টেকনিকাল স্কিল প্রয়োজন তার সবকটাই কবির করায়ত্ত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নিই। এর পরেই দেখুন সাদামাটা পয়ার ভেঙে ১১ অক্ষরের (!) ছন্দ :

চারি বর্গপতি।
ক চ-বরগের ক মহারথী :
ত প-বরগের ত কুলপতি ;
ন ট-বরগের ন নটবর ;
র স-বরগের র গুণধর ;—
চারি বরগের চারি অধিপ
বরণমালার কুলপ্রদীপ ॥

শুধু তাই নয়, পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রথম চার ছত্রের প্রথম অংশে ছ' অক্ষর, শেষের অংশে চার অক্ষর : ফলে জোর পড়বে সপ্তম অক্ষর ক, ত, ন, র-এর উপর। এবং সেইটেই লেখকের উদ্দেশ্য জোর দিয়ে শেখানো।

ঐ যুগে অনেকেই বৈষ্ণবদের "ঢলাঢলি" পছন্দ করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের বহু উর্ধ্বে। তাই :

'এই' 'এউ' 'আউ' ইত্যাদি ডিফ্‌থং-এর অনুশীলন করাতে এগুলো

নিয়ে কি রকম কবিতা ফেঁদেছেন, দেখুন :

আউলে গোঁসাই   গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ   টুটিয়া বাঁধ
দুই ভাই মিলি   আসিছে অই[১৪]
কি[১৫] মাধুরি আহা   কেমনে কই ॥
পাষাণ হৃদয়   করিয়া জয়
আধা-আধি করি   বাঁটিয়া লয়
শওশ হাজার   দোধারি লোক।
দোঁহারে নেহারে   ফেরে না চোক ॥
কূল ধসানিয়া   প্রেমের ঢেউ
দেখেনি এমন   কোথাও কেউ
এই নাচে গায় দু'হাত তুলি
এই কাঁদে এই   লুটায় ধূলি ॥

কে বলবে এটা নিছক রসসৃষ্টি নয়, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা ? নিতান্ত গদ্যময় শর্টহ্যাণ্ড—পদ্যে !

এর পর তিনি যেটা প্রস্তাব করছেন সেটি বহু বৎসর পরে মেনে নেওয়া হল :—

শুনিবে গুরুজি মোর কি বলেন ? শোনো !
তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো ॥
আর্-ত দিলে "আর্ত"-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর-দ চাপাইলে পিঠে রবে না গর্দভ ॥

---

১৪ এটি বহু বৎসর পরে বানান-সংস্কার সমিতি গ্রহণ করেন।

১৫ পরবর্তী যুগে তিনি প্রধানত বিস্ময় স্থলে (যেমন এখানে) কী লিখতেন। অবশ্য বানান-সংস্কার-সমিতির বহু পূর্বে।

ইষ্ট করিও না নষ্ট বোঝা করি পুষ্ট।
অর্ধে দিয়া[১৬] জলে ফেলি অর্ধে থাক' তুষ্ট॥
কর্মের ম এ ম ফলা অকর্ম্ম বিশেষ।
কার্যের যয়ে য ফলা অকার্য্যের শেষ॥

প্রথম পাঠ সাঙ্গ হলে 'কবি-মাস্টার' ভরসা দিচ্ছেন 'পুরো লেখা সাঙ্গ হবে অর্ধেক পাতায়।' এবং তদুপরি

কাগজ বাঁচিবে ঢের নাহি তায় ভুল।
বাঁচিতেও পারে কিছু ডাকের মাশুল॥

এ না হয় হল। কিন্তু গড়ের মাঠে যখন কংগ্রেসিরা (তখনো কমুনিস্টি আসেন নি) বাক্যের ঝড় বওয়াবেন তখন? তখন কি সেটা শব্দে শব্দে তোলা যাবে? না।

ওবিদ্যার কর্ম নহে—যখন বক্তার
মুখে ঝড় বহি চলে ছাড়ি হুহুঙ্কার—
তার সঙ্গে লেখনীর টক্কর লাগানো
এ বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে হয়েছে বাগানো।

তখন

মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার,
হস্তকে করিবে তার তুরুক-সোআর॥
হইবে লেখনী ঘোড় দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া॥

এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পুস্তক সমাপ্তিতে বলছেন:

তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ॥

১৬ এখানে দ্ধ আছে। আজকাল প্রেসে তার উপর রেফ দেবার ব্যবস্থা আছে কি না, অর্থাৎ দ+ধ+রেফ, জানিনা বলে পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলুম।

এ বইয়ের প্রতিটি ছত্র তুলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্থানাভাব। তবে সর্বশেষে কয়েকটি ছত্র না তুলে দিলে সে আমলের কয়েকটি তরুণ—আজ তাঁরা বৃদ্ধ—মর্মাহত হবেন। কারণ রেখাক্ষর তাঁরা না শিখলেও এ-কবিতাটি মুখে মুখে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে আজো সেটি কিয়জ্জনের কণ্ঠস্থ :—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর ॥[১৭]
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি ॥
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী,
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥[১৮]
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট[১৯] পথে হাটে।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুশ্‌খে বুক ফাটে ॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি।
ভূপৃষ্ঠে লুটায় পড়ে মর্মদাহে তাপি ॥
কষ্ট বলে অষ্ট সখী মর্মদাহে কোলে
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল ব'লে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥

১৭ প্রথম সংস্করণে এর পাঠ : বন্ধ হোলো বৃন্দাবনে যাহার যা কাজ।
ভঙ্গ হল ভৃঙ্গগীত কুঞ্জবন মাঝ ॥

১৮ ডোঙ্গাখানি ভাসিতেছে নবেন্দুসুঠাম/ পারাপার হইবার নাহি আর নাম।
কালিন্দী বহিয়া যায় কান্দ কান্দ স্বরে/ কুঞ্চিত কুন্তল প্রায় মন্দানিল ভরে ॥

১৯ দ্বিজেন্দ্রনাথ বরাবর 'রাষ্ট' লিখতেন ; 'রাষ্ট্র' লেখেননি।

দুষ্ট বধে পূরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট ॥ [২০]

কে বলবে প্রথমাংশ লেখা হয়েছে ন, ঙ, ম-প্রধান যুক্তাক্ষর ও ও দ্বিতীয়টি ষ প্রধান যুক্তাক্ষরের অনুশীলনের জন্য! আরেকটি কথা এই সুবাদে নিবেদন করি—আমার এক আত্মজনের মুখে শোনা: বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করতে চাইলেন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু, এসব কি আরম্ভ করলেন, রবি? বৃন্দাবনের রসরাজকে মেরে ফেলছেন যে!' বাঙলা সাহিত্য বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর কতখানি খাড়া, আজ সেটা স্বীকার করতে আমাদেব আর বাধে না। কিন্তু সেই মারাত্মক পিউরিটান যুগে, যখন কেউ কেউ নাকি কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীলবৃক্ষ' (এটা অবশ্য বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যঙ্গ—রিডাকসিও অ্যাড আবসার্ডাম পদ্ধতিতে) বলতেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতেন, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে গীতাব শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন করে ফেললে বৃন্দাবন-লীলা নিতান্তই মানবিক প্রেমে পর্যবসিত হয়; ভক্তজন তাঁদের আধ্যাত্মিক অমৃত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রথম যৌবন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্ম-সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন তাঁর এগারো বছর বয়সে 'আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে

তিনি (পিতা) নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'

২০ বলা বাহুল্য 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃষ্ট' বা কেষ্ট পড়তে হবে

এই গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা; এবং রেখাক্ষর বর্ণমালাতেও তিনি অনুশীলন হিসাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর মাত্র ত্রিশটি গান পাওয়া যায়, তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি বিস্তর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এমনই উদাসীন ছিলেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—যে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি।

ধীরে ধীরে তিনি সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাসের দর্শন সব জিনিস থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও তার অনুশীলনে নিযুক্ত হলেন। এ যে কী অভ্রভেদী দুর্জয় সাধনা তার বর্ণনা দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। এক দিকে ইয়োরোপীয় দর্শন তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল—অন্যদিকে বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—উপনিষদ, গীতা এবং মহাভারতের তত্ত্বাংশ। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শুধু স্পেকুলেট তথা তর্কবিতর্ক করতে শেখায় না। গোড়ার থেকেই ধ্যানধারণা, সাধনা করতে হয়। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান মেণ্টাল্ জিমনাস্টিক নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণায় মগ্ন হলেন।

এখনো বাঙলা দেশে বিস্তর না হোক, বেশ কিছু লোক বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁর সে ধ্যানমূর্তি দিনের পর দিন দেখেছেন। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই তিনি আগের দিনের বাসি জলে স্নান করে ধ্যানে বসতেন। সে সময় ছোটো ছোটো পাখী, কাঠ-বেরালি তাঁর গায়ের উপর এসে বসতো, ওঠা নামা করতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পাখীরা অপেক্ষা করতো, ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি তাদের খাওয়াবেন। ময়দার গুলি বানিয়ে মুনীশ্বর তার ব্যবস্থা করে রাখতো।

বহু বৎসর একাগ্রচিত্তে ধ্যানধারণা ও শাস্ত্র-চর্চার ফলস্বরূপ তাঁর গ্রন্থ, বাঙলা তত্ত্বকথার অতুলনীয় সম্পদ, 'গীতাপাঠ।'

এখানে এসে আমার ব্যক্তিগত মত অসঙ্কোচে বলছি—বিড়ম্বিত হতে আপত্তি নেই, যদি শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, আমার মতের কীই বা মূল্য—বাঙলা ভাষায় এরকম গ্রন্থ তো নেই-ই, ভারতীয় তথা ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনেও ভারতীয় তত্ত্বালোচনার এমন গ্রন্থ আর নেই।

যাঁদের সামনে (এবং খুব সম্ভব তাঁদের অনুরোধেই তিনি এ-গ্রন্থখানি লেখেন) তিনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনান (পুস্তকের ভূমিকায় আছে 'এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর-ক্রমে শুনানো হইয়াছিল') তাঁদের অনেকেই ইয়োরোপীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য (আজো তাই ইয়োরোপীয় দর্শনের পণ্ডিতদের কাছে এ-বইটি অমূল্য) তিনি প্রয়োজনমত ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের অভিমতও প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি: উপনিষদে আছে 'অবিদ্যা' শব্দটি; সেটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রে বলে এই যে ১। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, ২। কান্টের Thing-in-itself, ৩। Schopenhauer-এর অন্ধ Will, ৪। Mill-এর ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যা শক্তি, ইংরাজি ভাষায়—Permanent Possibility of Sensation, ৫। বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচনীয়া অবিদ্যা; পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচ রকমের বস্তু একই বস্তু।' পূর্বেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মূল উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, বেদান্ত (দর্শন) সাংখ্য ও যোগ। পাঠক আরো পাবেন, বেন্থাম, চার্বাক, সফিস্ট, স্টয়িক্, ডারুইন, ভোজরাজ যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ভাস্করাচার্য, সেন্ট আইগুস্টিন, নীলকণ্ঠ, স্পেন্‌সার প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ পুস্তিকায় পাঠক পাবেন কি? এর-নাম নাকি গোড়াতে ছিল

'গীতাপাঠের ভূমিকা'—পরে 'গীতাপাঠে' পরিবর্তিত হয়। সাংখ্য বেদান্ত তথা তাবৎ ইয়োরোপীয় জ্ঞান (এবং বিজ্ঞান ও) দর্শনের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তরুণ সাধককে গীতাপাঠ এবং তার অনুশীলনে নিয়ে যেতে চান।

তাই তিনি আরম্ভ করেছেন সাংখ্য নিয়ে।

'দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা।'

অর্থাৎ 'ত্রিবিধ দুঃখের (বাইরে থেকে, নিজের থেকে এবং দৈবদুর্বিপাকে ঘটিত দুঃখ) কিরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়।' এবং সেটা যেন 'একান্তাত্যন্ততোৎভাবাৎ' ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ না হয়; হয় যেন ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ। কারণ, দুঃখ লোপ পেলেই সুখ দেখা দেবে। যে রকম শরীর থেকে সর্বরোগ দূর হলে স্বাস্থ্যের উদয় হয়। তা ভিন্ন স্বাস্থ্য বলে অন্য কোনো জিনিস নেই। এবং এ-সুখ যা-তা সুখ নয়। উপনিষদের ভাষায় অমৃত, আনন্দ।

গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে তিনি এই তত্ত্বটি গীতা থেকে উদ্ধৃত করে আরো পরিষ্কার করে বলেছেন:

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ 'স্বস্থানে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছেন যে আপূর্যমান সমুদ্র, তাহাতে যেমন নদনদী সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, আর, চতুর্দিক হইতে কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; যিনি কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি না'।'

এরই টীকা করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, মানব-মাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

'আত্মসত্তার রসাস্বাদ-জনিত এক প্রকার নিষ্কাম প্রেমানন্দ যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণের অন্তরতম কোষে নিয়তকাল বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জীবাত্মার অনন্তকালের পাথেয় সম্বল, এবং সেইজন্য তাহারই পরিস্ফুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।' (গীতাপাঠ পৃঃ ১৬২)

এই চরম মোক্ষকেই মুসলমান সাধকেরা বলে থাকেন, ফানা ও বাকা। খৃষ্টীয় সাধকরা এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee'।

এদেশের একাধিক সাধকও ঐ একই বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন এ-যুগে কেন, সর্বযুগেই মানুষ সাধনার এই কঠিন পথ বরণ করতে চায় না। তাই তিনি গীতা পাঠের তৃতীয় অধিবেশনের অন্তে বলছেন :

'আনন্দ সম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম—এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা ; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারাবদ্ধ ; কাজেই আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্তার আন্দোলন এক প্রকাব "গাছে কাঁটাল—গোঁফে তেল।" এ-রকমের বাক্যবাণ আমার সহা আছে ঢের ; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম ;— যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ যোগে (অর্থাৎ প্রথম তিন অধিবেশনে তিনি যে অবতরণিকা নির্মাণ করেছেন তা দিয়ে—লেখক) তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত ; অতএব যাত্রী ভায়ারা পোঁটলা-

পুঁটুলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।'[২১]

এই অমূল্য পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করা আমার জ্ঞানবুদ্ধির ত্রিসীমানার বাইরে। তবে বর্ণনা দিতে গিয়ে এইটুকু নিবেদন করতে পারি; জড়-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, তথা জীবের সুখদুঃখ বিশ্লেষণ করার সময় তিনি প্রধানত শরণ নিয়েছেন সাংখ্যের, সাধনার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটি যোগের এবং আস্থা ও আশা রেখেছেন বেদান্তের উপর।

তবে এ পুস্তিকায় মৌলিকতা কোথায়? ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তিন দর্শন এক করে (প্রয়োজনমত ইয়োরোপীয় দর্শন দিয়ে সেটা আমাদের আরো কাছে টেনে এনে) তাঁর সঙ্গে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমজনিত দীর্ঘকালব্যাপী সশ্রদ্ধ সাধনা-লব্ধ অমূল্য নিধি যোগ করে, কবিজনোচিত অতুলনীয় তুলনা, ব্যঞ্জনা বর্ণনা দিয়ে অতিশয় কালোপযোগী করে তিনি এই পুস্তিকাখানি নির্মাণ করেছেন।

সকলেই বলে, এ পুস্তক বড় কঠিন। আমিও স্বীকার করি। তার প্রধান কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ একই সময়ে একাধিক ডাইমেনশনে বিচরণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পুনরায় সবিনয় নিবেদন করি, এ রকম কঠিন জিনিস এতখানি সরল করে ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেননি॥

২১ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলতেন, বাঙলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন; তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরেই একটি জুতসই—mot juste—সহজ বাঙলা শব্দ আসে তবে নির্ভয়ে সেখানে লাগানো উচিত। . অর্থাৎ তিনি 'গুরুচণ্ডালী' অনুশাসন মানতেন না।

রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ

কেউ দেশের জন্য প্রাণ দেয়, কেউ দয়িতের জন্য, কেউ বা বংশের সম্মানরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করে। যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হন তাঁদের অনেকেরই তখন শুদ্ধমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে, বিবেকের অলঙ্ঘ্য আদেশ পালন করার জন্যই নিজের জীবন বিসর্জন দেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন, কর্তব্যকর্ম না করলে তাঁরা মুক্তি-মোক্ষ-নির্বাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এদেশে সাধারণজনের ধারণা, মুক্তি বা মোক্ষের অর্থ নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে কঠোর-কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। অথচ আমাদের দেশে সর্ব দার্শনিক সর্ব ঋষি একবাক্যে বলেছেন মানুষের চরম কাম্য বা মোক্ষ বলতে বোঝায় পরিপূর্ণ, নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ—যে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখেরই তুলনা হয় না। মুসলমান সাধকরা ঐ কথাই বলেছেন, এবং ইহুদি মহাপুরুষ তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee." এবং এইটিই খৃষ্টানদের মূলমন্ত্র।

কয়েক মাস পূর্বে আমি 'মৃত্যু'—হয়তো 'শোক' বললে ভালো হত—নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু-দূত বার বার এসে তাঁকে যে কী গভীর বেদনা দিয়েছে তার বিবরণ দি। আরো বহু, বহু বেদনা তিনি পেয়েছেন, যার স্মরণে আপন জন্মদিন উপলক্ষে পিছন পানে তাকিয়ে বলছেন,

'পায়ে বিঁধছে কাঁটা
ক্ষতবক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,

জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।'[১]

এ-সব-কিছু তিনি সয়ে নিয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল দিয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পেয়েছেন, যখন তাঁর আত্মজন পেয়েছে আঘাত। যেখানে তাঁকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে, বেদনা-বেদনায় সে আত্মজনের ধূলিতলে অবলুণ্ঠন। সান্ত্বনা দেবার মত ভাষাও খুঁজে পাননি তখন। নিজের বেলা তিনি অন্তরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হন নি, কিন্তু আত্মজনের বেলা?

বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন শোক পায় মা, যখন সে পুত্রহারা হয়। এবং সে মাও যদি দুঃখিনী হয়, এবং ঐ পুত্রই যদি একমাত্র পুত্র হয়। এবং তার চেয়েও নির্মম আঘাত পান যদি সে মাতার আপন পিতা জীবিত থাকেন তবে তিনি। রবীন্দ্রনাথের বেলা তাই হয়েছিল। 'দুর্ভাগিনীকে' মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে বলছেন,

'তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার

১ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,
'যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা।' —পূরবী

ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ।
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।'

কী হৃদয়ভেদী তুলনা! যেন আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছে 'লাভা' হয়ে মাতার বাৎসল্যরস! তারপর সে মায়ের আকুলি-বিকুলি,

'সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে
খুঁজিছ বুকের ধন-সে আর তো নেই
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।'

এর চেয়ে নিদারুণতর বর্ণনা আর মানুষ কি দিতে পারে—মায়ের পুত্রশোকের? আমার লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। পাঠক, তুমি যদি পেয়ে থাকো, তবে সেটি আমায় পাঠিয়ো। না, ভুল বললুম, পাঠিয়ো না। পড়ে দরকার নেই।

'চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।'

স্বল্পপরিচিত জনের মৃত্যুসংবাদ শুনেই আমরা শোকে, এক অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাই—আর, এখানে কল্পনা করুন, বাচ্চাটিকে যে-মা ক্ষণতরে চোখের আড়াল হতে দিত না, যার

কণ্ঠস্বরের সামান্যতম রেশ, যার ক্ষুদ্রতম অঙ্গভঙ্গী তার চেনা, আর সে যখন হঠাৎ খেলা ছেড়ে ছুটে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো, 'মা', সে হঠাৎ নেই হয়ে গেল? চিরতরে? এ মহা-শূন্যতা—কল্পনায়—এ যে আপন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও নির্মম!

কিন্তু তারপর শুনুন, বীভৎসতার চূড়ান্ত :

দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

চরম দুঃখে মা যখন কোনো সান্ত্বনা পেয়ে তার পুজোর ঘরে মাথা কুটতে গেল—ইষ্টদেবতার সামনে—, যে-দেবতা যুগ যুগ ধরে এ-বংশের কত না দুঃখী, কত না দুঃখিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন, সে-দেবতা তখন যদি লজ্জায় গা ঢাকা দিতেন তাও কিছু বিচিত্র হত না, কিন্তু তার চেয়েও পৈশাচিক পরিস্থিতি। দেবতার জায়গায় হনুমান বসে মায়ের শোকের দিকে ভেংচি কাটছে!

* * * *

এ-সব দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির পথ কি রবীন্দ্রনাথ জানতেন না? জানতেন, খুব ভাল করেই জানতেন—অন্তত আমার মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একাডেমিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। অর্থাৎ কান্টের 'থিং ইন্ ইট্-সেল্ফ্' এবং বেদান্তের 'অ-সত্য' একই বস্তু কি না, ব্রহ্ম যেখানে নির্গুণ সেখানে ত্রিগুণ তাঁর ভিতরে লোপ পায়, না, তিনি তখন ত্রিগুণের অতীত এ-সব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এ-কথা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন ভারতীয় দর্শনের চরম আদর্শ আনন্দ। এবং সাংখ্য দর্শনের গোড়ার কথাই হচ্ছে, দুঃখের কারণ কি ভাবে, ঐকান্তিকরূপে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। আমার সঙ্গে সকলে একমত না হলেও নিবেদন করি, যোগ যত না ব্রহ্মানন্দের পথ নির্দেশ করেছেন, তার চেয়ে বেশী পথ

নির্দেশ করেছেন আপনাতে স্থির হয়ে আপন 'আনন্দময় কোষ' থেকে আনন্দ আহরণ করতে। বেদান্ত প্রণবমন্ত্রের অনুসরণে ত্রিভুবনে—অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—যা-কিছু আনন্দ আছে তা ব্রহ্মে লীন আছে জেনে সেই ব্রহ্মে যোজিত হয়ে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত-দেশব্যাপী পরিপূর্ণানন্দে লীন হতে আদেশ দেয়।

পাঠক! মা ভৈঃ! আমি তোমাকে দর্শনশাস্ত্রের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে অযথা হায়রান করতে চাইনে—যদিও আমার বিশ্বাস পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর তাঁদের মূল বক্তব্য আমাদের মত সাধারণ-জনের জন্যই বলে গেছেন, এবং সামান্য একটু শ্রদ্ধাভরে এঁদের মূল বক্তব্য বার বার পড়লে আপাতদৃষ্টিতে যা কঠিন বলে মনে হয় সেটি সরল হয়ে যায়। অবশ্য এঁরা প্রত্যেকেই যেস্থলে আপন বক্তব্য সপ্রমাণ করতে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে আপন বক্তব্যের কোন্‌খানে গরমিল সেটা বোঝাতে গিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেছেন—সেগুলো বোঝা পরিশ্রম ও ধ্যানসাপেক্ষ। যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হলে বৈদ্যরাজ প্রদত্ত কয়েকটি মূলসূত্র পালনই যথেষ্ট; পুরো আয়ুর্বেদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও নিষ্প্রয়োজন।

এ-সব তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন।

এবং সেটা সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

* * * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ কবিতা রচনা করে যান অস্ত্রোপচারের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। এবং সকলেই জানেন, সে অস্ত্রোপচার ব্যর্থকাম হয়, ও কবি অন্য কোনো রচনাতে হাত দিতে পারেননি। এ কবিতা সকলেই পড়েছেন, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য এটি তুলে দিচ্ছি:

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে

হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

শেষ লেখা ; ৩০ জুলাই ১৯৪১।

এস্থলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করবার জন্য কবিতা লিখতেন না। একথা তিনি নিজেও একাধিক বার বলেছেন। কবিতা তার

নিজের মহিমায় মহিমাময়ী,—দর্শন বিজ্ঞান এমন কি ধর্মের সেবা-দাসী হয়েও সে তার চরম মোক্ষের অনুসন্ধান করে না (ধর্মও ঠিক সেই রকম দর্শন বা বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়)। কাল যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঐতিহাসিক কড়ায় কড়ায় প্রমাণ করে দেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আদৌ হয়নি, কৃষ্ণার্জুন সংবাদের তো কথাই ওঠে না, তাহলেও গীতার মূল্য কানাকড়ি কমবে না। মধুসূদন যখন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।'

তখন তিনি এ-কথা সপ্রমাণ করতে কোমর বাঁধেননি যে 'আশার ছলনে' ভুলতে নেই। বস্তুত তিনি তারপরও আশার ছলনে ভুলেছেন, বেঁচে থাকলে আরো ভুলতেন—এবং না ভুললে আমাদের ক্ষতি হত।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু বলেন, এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মায় ধ্রুবতারা—প্রচণ্ড গতিবেগে কোন অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

'দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।'

তখন তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তারপর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জনবিরহ আমাদের বুকে যেরকম সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেইরকম।

তাই যখন কবি বলছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ' 'বিচিত্র ছলনাজালে

আকীর্ণ' করে রেখেছ তখন তিনি একটি সহজ সত্য অনুভব করেছেন। এটি দার্শনিক গবেষণা নয়।

এখন প্রশ্ন, এই 'ছলনাময়ীটি' কে ?

তিনি পরব্রহ্ম হতে পারেন না, কারণ তাঁর লিঙ্গ নেই, এবং এ-স্থলে শব্দটি পরিষ্কার স্ত্রীলিঙ্গে আছে।

তাই এখানে সাংখ্যদর্শনের আশ্রয় নিলে কবিতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝবার সুবিধে হয়—রসগ্রহণ অবশ্য অন্য ক্রিয়া।

'কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপন অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখ-দুঃখাদির গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখ-দুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন।'[১]

---

১ ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোঝাতেন উপনিষদ দিয়ে: 'বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যামায়া পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

উপনিষদে আছে: 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,
ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।'

অর্থাৎ,

'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে।
তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত।'
দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ।

এখানে স্পষ্টত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেটা সরল হয়, কাণ্ট যেটাকে thing-in-itself বলেছেন সেটাকে অবিদ্যা অর্থে নিলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই অর্থে

এ টীকাটি করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতা-পাঠ' গ্রন্থে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে এঁর মত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি তাঁর জীবনে আর দেখেননি।২ পাছে পাঠক ভাবেন আমি আমার নিজস্ব টীকা দিয়ে তাঁকে অতিশয় কঠিন বস্তু সাতিশয় সরল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের টীকা উদ্ধৃত করলুম।

তাহলে দাঁড়ালো এই :

'হে ছলনাময়ী' (অয়ি প্রকৃতি।), তুমি তোমার আপন হাতে 'সৃষ্টির পথ' (যে-পথ দিয়ে মানুষ চলে) 'বিচিত্র ছলনা' দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছ (যেমন দড়ির টুকরো দেখে সাপ ভেবে আঁৎকে উঠি, আবার ঝিনুকের টুকরোটাকে কোম্পানির টাকা ভেবে উল্লাসে নৃত্য করি)। তারপর কবি এই 'বিচিত্র ছলনা' উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছেন, চতুর্থ ছত্রে,—'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে।' যে 'জীবন সরল' বলে মনে হয়, সেখানে রয়েছে 'মিথ্যা বিশ্বাসের' ছলনা (তাই প্রকৃতি 'ছলনাময়ী')। এই 'মিথ্যা বিশ্বাস' কি সেটা রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতা লেখার সতেরো বছর পূর্বে বর্ণনা করেছেন—তাঁর আপন জীবনে,

'পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে সে হেসে হেসে,

নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'এই জিনিসই সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, শোপেনহাওয়ারের অন্ধ Will, Mill-এর ইন্দ্রিয়চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যাশক্তি, ইংরাজীতে Permanent possibility of sensation বেদান্তের সদসদ্ভ্যাসনির্বাচনীয়া অবিদ্যা।' সাংখ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বুঝবার চেষ্টা করলে সরল হয় বলে আমি সাংখ্য নিয়েছি।

২ শুদ্ধমাত্র পণ্ডিত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নাম করতেন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।

ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে সে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে।'

আর এ-কথা বুঝতে তো কণামাত্র অসুবিধা হয় না, সরলকেই ফাঁকি দেয় ধুরন্ধর! বিদ্যাসাগরের মত সরল লোকই ঠকেছেন সব চেয়ে বেশী!

এর পর আবার একটুখানি সাংখ্যদর্শনে আসতে হয়। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যার নাম মহান্ দেওয়া হয়েছে সেই ম হা ন্ শব্দের অর্থ অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন (বাঙলা মলিন অর্থে নয়, সংস্কৃত অর্থে অখণ্ডিত) বুদ্ধিতত্ত্ব।

এই মহান্-ই চিরানন্দের পথ দেখায়।

সেই মহান্-কে, 'হে ছলনাময়ী', তুমি 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' পেতে

'প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত'

অর্থাৎ মহান্-কে আচ্ছাদিত করেছ। সাংখ্যের সেই মহান্-কে এখানে কবি 'মহত্ত্ব'রূপে ব্যবহার করেছেন। এর পর বোঝার সুবিধার জন্য একটি 'কিন্তু' যোগ দিতে হবে।[৩] পড়তে হবে,

(কিন্তু) 'তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।'

এর পর বাকি কবিতাটুকু সহজ; তাতে তিনটি কথা আছে:

১। যে-পথ দিয়ে জীব ছলনা থেকে মুক্ত হয়ে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' পায়, সেটা তার ভিতরেই আছে। সেটা তার 'অন্তরের পথ'।

২। সে যখন মানুষকে সরল বিশ্বাস করে ঠকবে, সে হয়তো-

---

৩ মনে রাখতে হবে এ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ডিক্‌টেট্ করেন। যখন সেটি read-back করা হল তখন তিনি বলেছিলেন যে ওটাকে আবার দেখে দিতে হবে। সে সুযোগ তিনি পাননি।

জানতেই পারবে না যে তাকে বুদ্ধিমতী (ছলনাময়ী) তাকে ঠকাচ্ছে, এবং অন্য লোক তার সরলতা ও ছলনাময়ীর নষ্টামি দেখে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।'

৩। সে-ই শুধু 'শান্তির অক্ষয় অধিকার পায়' যে 'অনায়াসে' 'ছলনা সহিতে' পারে। সেই লোক যে ছলনাময়ীকে—তা সে রমণীরূপেই দেখা দিক, আর পুরুষরূপেই দেখা দিক (সে ছলনা—সে বেদনা—তিন প্রকারের হতে পারে ঃ ক) বাহ্যবস্তু-ঘটিত খ) আপনা-ঘটিত কিংবা গ) দেবতা-ঘটিত—অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টাল) সে যখন তার বেদনার জন্য দায়ী দুষ্টকে কঠোর সাজা দিয়ে প্রতিহিংসা নেয় না, হাসিমুখে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেয়—সে-ই পায় 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।' (অবশ্য সে তখন লোকের কাছে আরো বেশী হাস্যাস্পদ, বিড়ম্বিত।)

আবার অন্তরের পথে ফিরে যাই। এ-প্রবন্ধের সেইটেই মূল বক্তব্য।

এই অন্তরের পথের শেষ প্রান্তে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। কুরান শরীফও বলেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ।[৪]

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জীবনে কতবার উল্লেখ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনিই জীবন-দেবতা। যে-পাঠক 'জীবন-দেবতা' জাতীয় কবিতা কঠিন বলে মনে করেন তিনি যেন গল্পে গল্পে বলা—ঐ বিষয় নিয়েই—'সিন্ধুপারে' (চিত্রা) কবিতাটি পড়েন। কবি এক গভীর রাত্রে হঠাৎ ডাক শুনতে পেয়ে, ঘুম থেকে জেগে উঠে,

৪ কুরান শরীফ, ২৪ অধ্যায়, 'অন্-নূর' (জ্যোতিঃ) মণ্ডল দ্রষ্টব্য। বাইবেলেও মহাপুরুষ তাঁর প্রভু ইয়াহ্‌ভেকে অগ্নিরূপে দেখেছিলেন। সর্বকলুষ পুড়ে গিয়ে জীবাত্মা যখন অগ্নিশিখারূপে পরিবর্তিত হয় তখন ব্রহ্মাগ্নিতে লীন হতে মাঝখানে আর কোনো প্রতিবন্ধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন,

'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।'

'দুরু-দুরু বুকে' বাইরে এসে দেখেন, 'কৃষ্ণ অশ্বে' বসে আছে এক 'রমণীমূরতি'—'আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে অদূরে পুচ্ছ ভূতল চুমে।' কবিকে নিয়ে রমণী উধাও—'বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া।' তার পর কি হল, পাঠক নির্ভয়ে পড়ে নেবেন, ঠিক 'কথা ও কাহিনী'র গল্পেরই মত সরল—সাস্‌পেন্‌স্‌ নষ্ট হবে বলে আমি আর বাকিটা বললুম না।

এঁকে তিনি ঠিক চিনতে পারেন নি বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার দুঃখ করেছেন :

জানি, জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।'

এবং এই ধরনের ক্ষোভ ও আক্ষেপ কবি বহু শত বার করেছেন। এ নিয়ে কৌতূহলী তরুণ পাঠক চর্চা করলে উপকৃত হবেন।

তাহলে প্রশ্ন, এই 'অন্তরের পথ' ধরে তিনি সেই 'অন্তরের গহনবাসী'র সম্মুখীন হলেন না কেন?

তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল ছিল, জীবনমরণ পণ করে যে-কোনো সাধনার পথে এগিয়ে যাবার মত বিধিদত্ত বীর্যবল তাঁর ছিল, তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষোত্তম ছিলেন—এসব কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতার সম্বন্ধে এখানকারই এক গুরুজনকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কখনো পা পিছলোয় নি।'

তবে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সে সাধনা করলেন না কেন, যাতে করে তিনি দুঃখবেদনার ওপারে চলে যেতে পারেন?

আমার মনে হয়—এবং পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, এইখানে এসে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নাও হতে পারে—তাহলে তাঁকে কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হত। আমার দুঃখানুভূতি হবে, আমার আনন্দোল্লাস হবে, পুত্রবিয়োগে, সন্তানহারা মাতার হাহাকারে আমার অনুভূতির কেন্দ্র, আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ

উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তবে তো আমি সেটাকে রসস্বরূপে প্রকাশ করতে পারব। যদি মহাপুরুষের বাণী

'সর্বদা নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মনে তন্ময় হয়ে থাকবে'

বরণ করে নি, তবে সুখদুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে কি করে?

প্রাচীন যুগের কথা বলা কঠিন। এ যুগে দেখতে পাচ্ছি, যে-দ্বিজেন্দ্রনাথ (শুনেছি মধুসূদনের মত কবি তাঁর কবিতা পড়ে বলেছিলেন, ঐ একটিমাত্র লোক কবিতা লিখতে পারে; হ্যাট্‌ অফ্‌ টু ছ্যাট্‌ ম্যান্—তাকে নমস্কার) 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মত অতুলনীয় কাব্য রচনা করে বাগ্দেবীর বরপুত্ররূপে স্বীকৃত হলেন, তিনি যেদিন থেকে তাঁর 'অন্তরের পথে'র প্রয়াণ আরম্ভ করলেন, সেদিন রুদ্ধ হল—কিংবা আপন হাতেই তিনি রুদ্ধ করলেন—গোলাপের-পাপড়ি-ছড়ানো পথের শেষের ('প্রিম্‌রোজ্‌ পাথ টু ইটার্নেল বন্-ফায়ার') কাব্যলক্ষ্মীর দেউল-দ্বার। স্বামী বিবেকানন্দের অতুলনীয় সৃজনী-শক্তি ছিল; প্যারিসে (বোধ হয়) তিনি একখানা উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলেন—শেষ করলেন না কেন? শ্রীঅরবিন্দও কবিতা রচেছিলেন, কিন্তু সে তো গায়ত্রীর সমগোত্র—আপনার আমার নিত্য-দিনের হাসিকান্নার সন্ধান তাতে কোথায়? ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দক্ষিণ-ভারতের রমণ মহর্ষি উভয়ই এ-যুগের বিখ্যাত পরমহংস, জীবন্মুক্ত। সাধারণজনের সুখদুঃখ নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন অতি ললিত মধুর ভাষায়—কিন্তু সে তো রসসৃষ্টি নয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দাসী মুনিব-বাড়িতে কাজ করে নিখুঁৎভাবে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আপন বাড়িতে আপন বাচ্চার কাছে। আমরা এ-সংসারের কর্তব্য কর্ম করবো দাসীর মত, কিন্তু মন পড়ে রইবে ব্রহ্মের পদতলে!

এই উপদেশ নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, দাসীকে যদি আদেশ করা হয়, তাকে কাপড় কাচা বাসন-

মাত্রার মেকানিক্যাল্ রুটিন কাজ নয়, তাকে তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান, কিংবা উদ্ভাবন করতে হবে কাঁথা সেলাইয়ের নিত্য নব প্যাটার্ন—পারবে কি সে? দাসী কেন যদি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলা হত, জমিদারী চালানো বা ছাত্র-অধ্যাপনা নয়—এগুলো মোটামুটি মেকানিক্যাল্ কাজ—তোমাকে তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান কিংবা রচতে হবে কবিতা, অথচ তোমার সর্বসত্তা পড়ে থাকবে পরব্রহ্মের পদপ্রান্তে, তবে তিনি কি সেটা পারতেন? এই ডবল তন্ময়তা কি সম্ভবপর? হয়তো ধর্মসঙ্গীত রচনার সময় সম্ভবপর (যদিও কেউ কেউ বলেন, তাঁর ধর্মসঙ্গীত অনবদ্য হলেও তাঁর প্রেম বা প্রকৃতি সঙ্গীতের তুলনায় নিচে) কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনার স্মরণে তন্ময় হয়ে সে-বেদনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর, বিশ্বজননমস্য রূপ দিয়ে সৃষ্টি করা কি সম্ভবপর? দুঃখে যে-জন অনুদ্বিগ্নমনা সুখে যে-জন বিগতস্পৃহ সে তো শান্ত; শান্ত রস কি রস? খৃষ্টান মিস্টিক্ তরুণ সাধককে বলেছেন, 'যা বলার এই বেলা বলে নাও। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাবে তখন আর-কোনো-কিছু বলতে চাইবে না।'

চতুর্দিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ উঠবে—আমি জানি—তবু ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করে যাই, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মানন্দে লীন হতে চাননি। তিনি আমাদের মত পাপীতাপীদের যে ভাঙা নৌকা, সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাননি। সুখের মলয় বাতাসে ঝঞ্ঝাবাতের ক্রূর আঘাতে নিমজ্জমান তরীতে বসে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, আমাদেরই হৃদয়ের গীতি—যে গীতির প্রকাশ-ক্ষমতা আমাদের নেই।

যুধিষ্ঠিরের মত তিনিও স্বর্গারোহণ করতে চাননি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি—আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরলো কে ? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল। শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরো কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের শতদোষ থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মত লোক মানবজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশী।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরী। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন্ এক নিভৃত কোণে কে কোন্ গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কি করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন্ এক অখ্যাতনামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে—ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ ! আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু

তাই নয়, এ-পণ্ডিত কোন্ বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন—সে দিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনো কোনো স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণিকাঞ্চন সংযোজিত বিজয়-মাল্য একদিন পরতে পেরেছিল।

* * *

সে যুগের প্রবাসীতে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুতো, এ যুগের কোনো মাসিক কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি,—ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দী বা অন্য কোনো অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব্ লস্ট কজেস—তাবৎ বাঙলা দেশে দু'জন কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বেন, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক রামানন্দ জানতেন 'কান্টিয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'১ জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মত আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি

১। হুবহু শিরোনামাটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সূফীতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সূফীতত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২।১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নূতন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্‌ব‌্ল্‌ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্‌ কজ্‌। এরকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্যদিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্ব কথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনো ভেজাল বেচেন নি।

এই পাবলিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র সে কথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়—এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ন রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ন রিভ্যু খাস লণ্ডনে প্রচারিত যে কোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা

দিতে পারতো। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরিজি মাসিক বেরোয় নি।

* * *

প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই ; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে—'হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'—লিখবেন) এই একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্ট ভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মত বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশ বার বলবো, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্যপথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোন সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হয়েও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * *

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

সরলাবালা

সরলাবালার অমরাত্মার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাই।

বাঙলার সংস্কৃতি জগতে তিনি এতই সুপরিচিতা যে, বহু কীর্তিমান লেখক তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করবেন, তাঁর সরল জীবনাদর্শ তিনি দেশের দশের চিন্ময় জগতে যে কতখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তা দেখে বার বার বিস্ময় মানবেন।

কিন্তু আমরা যারা তাঁর স্নেহ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি—আমাদের শোকের অন্ত নেই যে, আজ আমরা যাঁকে হারালুম, তাঁর আসন নেবার মত আর কেউ রইলেন না। সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী মাতার মত। আমরা জানতুম, যে সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্রিকার জগতে আমরা বিচরণ করি, সেখানে নানা বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু এ-কথাও আরো সত্যরূপে জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ফরিয়াদ-আর্তনাদ এমন একটি মাতার কাছে নিয়ে যেতে পারবো, যেখানে সুবিচার পাবই পাব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না।

১৯৪৪ ইংরিজিতে আমি 'সত্যপীর' নাম নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পরবর্তী স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। দুটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই সরলাবালার এক আত্মীয়, আমার বন্ধু এসে আমাকে জানালেন, আমার লেখা তাঁর মনঃপূত হয়েছে।

নিজেকে ধন্য মনে করেছিলুম। ঐ দিনই আমার আত্মবিশ্বাসের সূত্রপাত।

তাই আজ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও বার বার মনে পড়ছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরলাবালার অনুমোদন না

পেলে বাঙালীকে আমার সামান্য যেটুকু বলার ছিল, সেটুকু বলা হত না।

একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু ঠেকবে, কিন্তু আজ যদি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা সর্বজনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ না করি, তবে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ-নেমকহারামের আচরণ হবে। বরঞ্চ সে-আচরণ দৃষ্টিকটুকর হোক।

এ-কথা সত্য, 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান', 'দেশ' পত্রিকায় আমার একাধিক বন্ধু ও স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদেরই একজনের—এঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—মাধ্যমে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু এ-কথা আরো সত্য যে, এঁরা সকলেই সহৃদয় বলে আমার মত আরো বহু বহু অচেনা অজানা লেখককে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছেন। সুরেশচন্দ্র যেমন একদিকে পাকা জহুরীর মত কড়া সমালোচক ছিলেন, অন্য দিকে ঠিক তেমনি অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে তিনি অনেক সময় অভাজন জনকেও গ্রহণ করতেন—আমি তাদেরই একজন।

সুরেশচন্দ্রকে আমি বাঘের মত ডরাতুম, যদিও খুব ভালো করেই জানতুম যে, তাঁকে ডরাবার কণামাত্র কারণ নেই। কঠিন কথা দূরে থাক—যে ক'বৎসর আমি তাঁর স্নেহ-রাজত্বে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তার মধ্যে একদিন একবারও তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেননি, কোনো আদেশ বা উপদেশও দেননি।

মনে পড়েছে ১৯৪৪-৪৫ কলকাতায় একবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। আফ্‌টার-এডিট না লিখে লিখলুম একটি কবিতা। মনে ভয় হল, আফটার-এডিটের এরজাৎস্ তো কবিতায় হয় না। তাই এ নিয়ে গেলুম সুরেশবাবুর কাছে স্বহস্তে। তিনি মাত্র দুটি ছত্র

পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। 'ওরে—এঁকে চা দে, আর কি দিবি দে, আর'—বাক্য অসমাপ্ত রেখে তিনি ফের কাজে মন দিলেন।

তবু তাঁকে আমি ডরাতুম। কিন্তু যেদিন শুনলুম, সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন সরলাবালাকে এবং তিনি আমার রচনার উপর আশীর্বাদ রেখেছেন, সেদিন আমার মনে এক অদ্ভুত সাহস সঞ্চার হল। আমার মনে হল, পত্রিকা জগতের সুপ্রীম কোর্টের (তখন বোধ হয় প্রিভি কৌন্সিল ছিল) চীফ জস্‌টিসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল—সে জগতে যদি আমার মনোবেদনার কারণ ঘটে, তবে আপীল করবো খুদ সুপ্রীম কোর্টে। অবশ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমাকে কখনো স্মল-কজ কোর্টেও যেতে হয়নি। হবে না, সে বিশ্বাসও ধরি।

এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। বহু কর্মী, প্রচুর সাহিত্যিক আমার কথায় সায় দেবেন।

সরলাবালা ফঁ্যা দা সিয়েক্লের (এণ্ড অব দি সেঞ্চুরির) লোক। গত শতাব্দীর শেষ এবং এ শতাব্দীর অর্ধাধিক তিনি দেখেছেন। ফরাসীতে যেমন এঁদের ফঁ্যা দ্য সিয়েক্লের প্রতিভূ বলে, আরবীতে ঠিক তেমনি বলে জুঁ অল্‌-করনেন্‌—'দুই শতাব্দীর মালিক'। এঁদের সম্বন্ধে লেখা কঠিন। বঙ্কিম রমেশের মধ্যাহ্ন গগন, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের উদয় সরলাবালা চোখের সামনে দেখেছেন—এবং আর পাঁচজনের তুলনায় অনেক বেশী ভালো করে দেখেছেন, কারণ সাহিত্যে তাঁর রসবোধ ছিল তো বটেই, তদুপরি তাঁর আসন ছিল ঘোষ সরকার উভয় পরিবারের পত্রিকা-জগতের মাঝখানে। একদিকে বৈষ্ণবধর্মের রসকুণ্ডে তিনি আবাল্য নিমজ্জিতা, অন্য দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন, বিবেকানন্দের কর্মযোগ এবং সর্বশেষ শ্রীঅরবিন্দের সাধনার তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। অত্যন্ত উদারচিত্ত না হলে মানুষ এ তিনটেকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। আমার কাছে আরো আশ্চর্য বোধ হয়, যে রমণী কোনো বিদ্যালয়েও

কখনো যাননি, চিরকাল অন্তঃপুরের অন্তরালেই রইলেন, তাঁর পক্ষে এতখানি উদার, এতখানি ক্যাথলিক্ হওয়া সম্ভব হল কি প্রকারে?

ফঁ্যা ছ সিয়েক্ল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু পড়েছি, কিন্তু তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্তটাই পুরুষের লেখা। তার মাঝখানে সরলাবালার কোমল নারীহৃদয় সবকিছু অনুভব করছে হৃদয় দিয়ে, মাতৃরসে সিক্ত করে। ইংরিজিতে বলতে গেলে বলবো, তাঁর বর্ণনা 'রিচ্ উইদ্ নলিজ' না হতে পারে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় অতিনিশ্চয় 'রেডিয়েণ্ট উইদ্ লাভ্।'

অথচ তাঁর লেখাতে ভাবালুতা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নেই। অত্যন্ত মধুর, আন্তরিক লেখার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাই, কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের—ডিটাচমেণ্টের—ভাব। আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল থেকে অনেক শোক পেয়েছিলেন বলেই বৈরাগ্যযোগে আপন চেষ্টায় সেসব শোক সংহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনাতে পদে পদে তারই পরিচয় পাই।

ছেলের হৃদয়ের আঁকুবাঁকু মা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেন, এবং তিনি যখন সেটা সরল ভাষায় প্রকাশ করেন, তখন ছেলে বিস্ময় মানে, যে জিনিস সে-ই ভালো করে বুঝতে পারেনি, মা বুঝল কি করে এবং এত সরল ভাষায় প্রকাশ করলো কি করে?

বাঙলার চিন্ময় জগতে সরলা ছিলেন মাতৃরূপা। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতৃক্রোড় পেতে দিয়েছিলেন বাঙলার তরুণকে। তাই শুনতে পাই, বাঙালীর উপর যখনই অত্যাচার এসেছে, তিনি ক্ষুব্ধা মাতার মত অনশন করেছেন। এবং তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালীর মনোবেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অতি মহৎ ভাষায় সেটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সে ভাষায় আছে দার্ঢ্য অথচ মাধুর্য।

এবং সর্বোপরি সে ভাষা অতিশয় সরলা!

সার্থক নাম সরলাবালা॥

হাসনুহানা

বছর বারো পূর্বে ভারতীয় একখানা জাহাজ সুয়েজের কাছাকাছি লোহিত সাগরে আগুন লেগে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কাপ্তেন সারেঙ্গ মাঝিমাল্লা বেবাক লোক মারা যায়। আশপাশের জাহাজ মাত্র একটি অর্ধদগ্ধ জীবন্মৃত খালাসীকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তাকে সুয়েজ বন্দরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবরের কাগজে মাত্র কয়েক লাইনে সমস্ত বিবরণটা প্রকাশিত হয়, এবং সর্বশেষে লেখা ছিল, সেই অর্ধদগ্ধ খালাসীটি কাতর কণ্ঠে শুধু জল চাইছে কিন্তু বার বার জল এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জল খাচ্ছে না।

অলস কৌতূহলে আমি আর পাঁচজনের মত খবরটা পড়ি। কিন্তু হঠাৎ মগজের ভিতর ক্লিক্ ক্লিক্ করে কতকগুলো এলোপাতাড়ি ফেলে-দেওয়া টুকরো টুকরো তথ্য একজোট হয়ে কেমন যেন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে ফেলল।

প্রথমত, সুয়েজ বন্দরের কাছে-পিঠে আমি আমার প্রথম যৌবনের একটি বছর কাটিয়েছিলুম। সেখানে 'জল'-কে 'মা-ই' বলা হয়, যদিও খাঁটি আরবীতে 'জল'-কে 'মা-আ' বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয় জাহাজের খালাসী পুব বাঙলার মুসলমান হওয়ারই কথা। এবং পুব বাঙলার, বিশেষ করে সিলেট মৈমনসিং অঞ্চলে 'মা'-কে 'মা-ই' বলে।

অতএব খুব সম্ভব ঐ অর্ধ-দগ্ধ খালাসী বেচারী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে কাতর-কণ্ঠে আপন মাতাকে স্মরণ করে বার বার যে 'মা-ই' 'মা-ই' বলছিল তখন সে সুয়েজের আরবীতে জল চাইছিল না। তাই জল দেওয়া সত্ত্বেও সে সে-জল প্রত্যাখ্যান করছিল।

অর্থাৎ একই শব্দ একই ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরতে পারে।

তাই একটি শব্দ নিয়ে আমি হালে অনেক চিন্তা করেছি।

হাস্নুহানা। রাজশেখরবাবু এইভাবেই বানান করেছেন। কিন্তু বানান নিয়ে আমার মাথাব্যথা নয়। শিরঃপীড়া শিকড়ে। অর্থাৎ শব্দটার রূট কি? ব্যুৎপত্তি কি?

রাজশেখর বলছেন, [জাপানী।=পদ্মফুল] সাদা সুগন্ধ ছোট ফুল বিঃ (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত)।

সুবল মিত্র বলছেন, জাপানী। একরকম ছোট সুগন্ধী ফুল।

বাংলায় আর যে দুখানা উত্তম অভিধান আছে তার প্রথম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ এবং দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। উভয় অভিধানেই শব্দটি নেই। এটা কিছু বিচিত্র নয়। পঞ্চাশ ষাট বছর মাত্র হল শব্দটা লেখাতে ঢুকেছে—আমার যতদূর জানা।

শুনেছি, বাংলা থেকে সংস্কৃতাগত শব্দ বাদ দিলে শতকরা ষাটটি শব্দ আরবী ফার্সী কিংবা তুর্কী। ডজন দুত্তিন পর্তুগীজ এবং শ' কয়েক ইংরিজি। ফরাসী ইত্যাদি নগণ্য। জাপানী আর কোনো শব্দ বাঙলাতে আছে বলে জানিনে। আমরা শান্তিনিকেতনের লোক 'কিমোনো'—জাপানী আলখাল্লা—শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু সেটি কোনো অভিধানে ঢুকেছে বলে জানিনে, সাহিত্যে তো নয়ই। কিমোনো পরিহিত সত্যপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাওয়া যায়।

তাই প্রশ্ন, হঠাৎ দুম্ করে একটা জাপানী শব্দ বাঙলায় ঢুকল কি করে? তবে কি জাপান থেকে এসেছে হাস্নোহানা ফুল? সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা? চিত্রকর বিনোদ মুখুজ্যে, নন্দলালের নন্দন বিশ্বরূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জাপান দেখে এসেছেন। অন্ধ্রের বীরভদ্র রাও, মালাবারের হরিহরণ। এঁরা সবাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তাই এঁদের চিনি। এঁরা সবাই অজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে

বলেন হাসনোহানা ফুল জাপানে নেই—অর্থাৎ আমরা এদেশে যেটাকে হাসনোহানা বলে চিনি—এবং শব্দটার ব্যুৎপত্তি জাপানী এ সম্বন্ধে সকলেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার অন্যতম কারণ এঁরা সকলেই বাঙলা জানেন—বীরভদ্র হরিহরণ শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সাহচর্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখেছেন—এবং জাপানী আর কোনো শব্দ হুট্ করে বাঙলায় ঢুকে গিয়ে থাকলে তাঁরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

কলকাতার উর্দুভাষী, তথা বাঙলা এবং উর্দু দোভাষীরা বলেন, হুস্‌ন্-ই-হিনা। 'হুস্‌ন্' শব্দটি আরবী, অর্থ সৌন্দর্য, খুবসুরতী—যার থেকে আমাদের মহরমের হাসন হোসেন জিগির—স্লোগান—শব্দদ্বয় এসেছে। 'হিনা' শব্দ বাঙলায় হেনা। রবীন্দ্রনাথের গান আছে হেনা, হেনার মঞ্জরী। হেনা শব্দের অর্থ মেহদি। হাসনোহানার পাতা অনেকটা মেহদি-পাতার মত। তাহলে দাঁড়ালো এই 'হেনার সৌন্দর্য'। অর্থাৎ সুন্দরতম হেনা। অর্থাৎ হেনা par excellence। কিন্তু জিনিসটা তো আর 'হেনা' নয়।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্ণৌ-দিল্লি, আজমীর-বরদা সর্বত্রই এ ফুলটি ডাকা হয় রাতকী রানী নাম ধরে। গুজরাতে অবশ্য রাত-নী রানী ধরে। অর্থ, রাতের রানী। হুস্‌ন-ই-হিনা সমাস এঁরা চেনেন না। দিল্লিতে আপনি হাসনোহানার আতর কিনতে পাবেন। কিন্তু চাইবার সময় বলতে হবে, রাতকী রানীর আতর। হাসনো-হানা বা হুসন-ই-হিনা বললে চলবে না। খাস হেনার আতর আলাদা।

কাবুল কান্দাহার তব্রীজ তেহরানে এ ফুল নেই। ত্রিশ বছর পূর্বে ছিল না এ-কথা আমি বুক ঠুকে বলতে পারি। হেনা অর্থাৎ মেহদি পাতা অবশ্য আছে। এবং ইরানের কবিরা ভারতের মেহদির প্রচুর গুণ-গান গেয়েছেন। যথা—

পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা
ইরাণ দেশের ভুঁয়ে,
মেহদীর পাতা কড়া লাল হয়
ভারতের ভুঁই ছুঁয়ে।
নীস্ত দর্ ঈরান্ জমীন্ সমান-ই
তহসীল-ই কামিল
তা নিয়ামিদ্ সোঈ হিন্দোস্তান
হিনা রঙীন ন্ শুদ্।[১]

হাসনোহানা গাছ ইরান-তুরানে নেই কিন্তু শব্দটা তো অভিধানে থাকতে পারে—যেমন 'আকাশ কুসুম' কিংবা 'অশ্ব-ডিম্ব' ত্রিভুবনে নেই বটে (যদিও তার অনুসন্ধান চলে, যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান') তবু অভিধানে শব্দগুলো পাওয়া যায়। হাতের কাছে রয়েছে ষ্টাইনগাস্ সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট—এমন কি সর্বোৎকৃষ্ট বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অভিধান। আর রয়েছে ক্যাথলিক পাদ্রী হাভা সাহেবের আরবী কোষ, বেইরুৎ থেকে প্রকাশিত। এই

১ উর্দুতে হেনা নিয়ে অজস্র দোহা কবিতা আছে। হেনা বলছে—

পিস্ গয়ী তো পিস গয়ী,
খূঁ হো গয়া তো হো গয়া
নাম তো বর্গে হিনাকা
দুল্হিনোঁ মে হো গয়া

'আমায় পিষে ফেললে তো ফেললে, আমি রক্তাক্ত হয়ে গেলুম তো গেলুম। কিন্তু কনেদের ভিতর তো মেহদি পাতার নাম রাষ্ট্র হল।' ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান কনেদের মেহদি দিয়ে হাত রাঙা করতে হয়। আরেক কবি বলছেন, 'হেনার পাতার উপর হৃদয়-বেদনা লিখি; হয়তো পাতাটি একদিন প্রিয়ার হাতে পৌছবে।'[১]

ফার্সী আরবী কোনো কোষেই হুস্‌ন-ই-হিনা নেই। 'হুস্‌ন্‌' ও 'হিনার' মাঝখানে যে 'ই' আছে এটি খাঁটি ফার্সী। কাজেই এই সমাসটি আরবী অভিধানে থাকার কথা নয়। তবু, যেহেতু আরবরা ইরান বিজয়ের পর বহু ফার্সী শব্দ আপন ভাষায় গ্রহণ করে, তাই ভাবলুম, হয়তো শব্দটা থাকতেও পারে। বিশেষ করে ফুলের মামেলা যখন রয়েছে। কারণ 'গুল্‌' ফার্সীতে 'ফুল'।

'আপ' (সংস্কৃত অপ্‌) ফার্সীতে 'জল'। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি গোলাপ ফুল। আসলে কিন্তু গোলাপ (গুলাপ) অর্থ রোজ-ওয়াটার। আরবীতে 'গ' এবং 'প' ধ্বনি নেই বলে গোলাপ হয়ে গেল 'জুলাব'। গোলাপ-জল বিরেচক। তাই বাঙলাতে 'জোলাপ' 'গোলাপ' দুটি সমাসই প্রবেশ করেছে।

তা সে যাই হোক, আরবরা যখন 'গুল' নিয়েছে তখন হাসনো-হানা নিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু আরবী অভিধান নীরব। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উর্দু অভিধানও শব্দটির উল্লেখ করে না। উত্তর প্রদেশের উর্দু-ভাষীরা হাসনোহানাকে 'রাতকী রানী' বলেন বলুন, কিন্তু কোষকার কলকাতায় প্রচলিত হুস্‌ন্‌-ই-হিনা তাঁর অভিধানে দিলে ভালো করতেন।

তাই আমার সমস্যা :—

(১) হয় শব্দটা জাপানী থেকে এসেছে।

(২) নয়, এটি কলকাতার উর্দুভাষীদের নিরবদ্য 'অবদান'।

পাঠক ভাববেন না আমি রাজশেখরের ভুল দেখাবার জন্য এ আলোচনা তুলেছি। রাজশেখর শত ভুল করলেও তাঁর অভিধান চলন্তিকা শতায়ু—সহস্রায়ু। চলন্তিকা চলে এবং চলবে।

আমার নিবেদন, বাঙলা দেশে এখন গোটা চারেক বিশ্ববিদ্যালয়।

সেগুলোতে বাঙলা ভাষা পুরো সম্মান পাচ্ছে। বাঙলায় আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ নিয়ে পয়লানম্বরী গবেষণা হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কোন পাঠক-পাঠিকা যদি বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন তবে বড় উপকৃত হই।[২]

---

২ 'হাসনোহানা' যখন "দেশে" বেরয় তখন এ বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় একাধিক পত্র 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাড়ির লোক আমার লেখার কাটিং রাখে, আলোচনার রাখে না। যতদূর মনে পড়ছে, একাধিক লেখক আপ্রাণ চেষ্টা দেন, আমাকে বোঝাবার জন্য, 'হাসনো-হানা' ও 'হেনা' ভিন্ন। আমার রচনাটি একটু মন দিয়ে পড়লে আমি যে দুটোতে ঘুলিয়ে ফেলি নি সেটা পরিষ্কার হবে। 'হেনা—pax excellance' এস্থলে ঐ দুটি ফরাসী শব্দ বোঝায় যে par excellence রূপ যে বস্তু ধারণ করে, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্র ও বর্ণের হতে পারে। একটি মহিলা সুদূর 'হৈদ্রাবাদ' থেকে 'হেনা' ও 'হাসনোহানা'র পাতা আলাদা করে, নিশ্চয়ই অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করে, পাঠান। তাঁকে ধন্যবাদ। দুটি গাছই আমার বাগানে আছে॥··· অন্য একজন লেখেন, "সুনীতিবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, হাসনোহানা জাপানী শব্দ।" সুনীতিবাবু দৃঢ় না ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক নয়, গুরুত্ব ধরতো যদি পত্রলেখক সুনীতিবাবুর যুক্তিগুলোর উল্লেখ করতেন। কারণ আমার এক সহকর্মী হিন্দী ও উর্দু বাবদে তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে, সুনীতিবাবুরই মত যশস্বী পণ্ডিত (নাম বলে কাউকে 'বুলি' করার কী দরকার!) দৃঢ়তর কণ্ঠে বলেন, সমাসটা ফার্সী—এদেশে নির্মিত॥··তবে এস্থলে বিশ্বকোষের শ্রীযুত পূর্ণ মুখুয্যে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি লেখেন যে, যে সময়ে এদেশে হাসনোহানা ফুল বিদেশ থেকে আসে তখন জাপানীরা কলকাতার বাজারে 'হাসনোহানা' নাম দিয়ে একটি সুগন্ধি পদার্থ (সেণ্ট) ছাড়ে। তাঁর চিঠির ভাবার্থ এই ছিল। তাই আমার মনে হয়, সেই সেণ্টের নাম নিয়ে ঐ সময় আগত বিদেশী ফুলকে 'হাসনোহানা' নাম দেওয়া হয়। এটা অসম্ভব নয়। প্রাগুক্ত উর্দু পণ্ডিত সেটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তিনি ছেলেবেলা থেকেই 'হুস্‌ন্-ই-হিনা' শুনেছেন। ঐ সেণ্ট কলকাতা আগমনের বহু পূর্ব থেকে।

বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি

আজ যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত পুস্তকপত্র থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হয় তা হলে এ দেশে মুসলমান ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিয়ে বিলক্ষণ তর্কের অবকাশ থাকবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, মুসলমান-আগমনের পরও প্রচুর সংস্কৃত পুস্তক লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পান নি সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর জমিজমার উপর হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফলে তাঁদের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা বিশেষ মন্দীভূত হয় নি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই আপন আপন লেখনী সঞ্চালনা করেছেন।[১] অল্লোপনিষদ্ জাতীয় দু-চারখানা পুস্তক নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। বরঞ্চ এরা সত্যানুসন্ধানকারীকে পথভ্রষ্ট করে।

১ টয়িনবি সাহেব যে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেন বর্তমান লেখক সে নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। শুধু যেখানে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হবে সেখানেই এই নীতি মানা হবে। এস্থলে তাই শুধু উল্লেখ করি, যখনই কোন জাতি বৈদেশিক কোনো ভিন্নধর্মাবলম্বীদ্বারা পরাজিত হয় তখন নূতন রাজা এঁদের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কোনো প্রধানকর্মে আমন্ত্রণ জানান না বলে এঁদের এক মানসিক পরিবর্তন হয়। এঁদের চিন্তাধারা তখন মোটামুটি এই : 'আমাদের ধর্ম সত্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা ম্লেচ্ছ বা যবন কর্তৃক পরাজিত হলুম কেন? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, আমরা আমাদের ধর্মের প্রকৃতরূপ বুঝতে পারি নি। ধর্মের অর্থকরণে (ইন্টারপ্রিটেশনে) নিশ্চয়ই আমাদের ভুল রয়ে গিয়েছে। আমরা তা হলে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেখি, ত্রুটি কোন্ স্থলে হয়েছে।' ফলে পরাজয়ের পরবর্তী যুগে তাবৎ সৃষ্টিশক্তি টীকাটিপ্পনী রচনায় ব্যয় হয়।

এ এক চরম পরম বিস্ময়ের বস্তু। দশম, একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আবু-র্-রইহান মুহম্মদ অল-বীরূনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রামাণিক পুস্তকে একাধিকবার সবিনয় বলেছেন, 'আমরা (অর্থাৎ আরবীতে) যাঁরা জ্ঞানচর্চা করি, দার্শনিক চিন্তা আমাদের মজ্জাগত নয়। দর্শন নির্মাণ করতে পারে একমাত্র গ্রীক ও ভারতীয়েরা।'

সেই ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান-আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিও-প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বূ আলীসিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালী[২] (লাতিনে অল-গাজেল), আবূ রুশ্‌দ্‌ (লাতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো-আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। তিনিও জানতে পেলেন না যে, তিনি প্লাতোর আদর্শবাদ দৃঢ়ভূমিতে নির্মাণ

২ ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত পথপ্রদর্শক বা ইমাম। ইনি দার্শনিক—কিয়ৎকালের জন্য নাস্তিক—এবং পরিণত-বয়সে সূফী (মিস্টিক, ভক্তিমার্গ ও যোগের সমন্বয়কারী) হয়ে যান। এঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'কিমিয়া সাদৎ' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই পুস্তকের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিধুশেখর অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ 'টোলো পণ্ডিত' ছিলেন। স্মরণ রাখবার সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য—গজ্জালীর মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে।

করার জন্য যেসব যুক্তি আকাশ-পাতাল থেকে আহরণ করছেন তাঁর পাশের চতুষ্পাঠীতেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের আদর্শবাদ সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি 'গুলাত' নাস্তিকদের জড়বাদ যেভাবে খণ্ডন করছেন, ব্রাহ্মণও চার্বাকের নাস্তিকতা সেইভাবেই খণ্ডন করছেন। এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক-সুশ্রুতের আরবী অনুবাদেপুষ্ট বু আলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র—'য়ুনানী' নামে প্রচলিত (কারণ তার গোড়াপত্তন গ্রীক [আইওনিয়ান = য়ুনানী] চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর)—আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে। সিনা-উল্লিখিত যে-ভেষজ কি, তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা ওষধিবনস্পতি এ দেশে (অর্থাৎ আরবে) জন্মে না, সেগুলো যে তাঁর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড়ে গজাচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না। কিঞ্চিৎ কল্পনাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে মৌলার বেগমসায়েবা সিনা-উল্লিখিত কোনো শাক তাঁকে পাক করে খাওয়ালেন, আর তিনি সেটি চিনতেই পারলেন না।

পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই আওরেঙ্গজেবের অগ্রজ যুবরাজ মুহম্মদ দারাশীকূহ্। ইনিই সর্বপ্রথম দুই ধর্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক লেখেন। তার অন্যতম মজমা'-উল্-বহরেন, অর্থাৎ দ্বিসিন্ধুসঙ্গম। দারাশীকূহ্ বহু বৎসর অনাদৃত থাকার পর তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা বিশ্বভারতীতেই হয়। শ্রীযুত বিক্রমজিৎ হস্‌রৎ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'দারাশীকূহ্ঃ লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' নামক একখানি অত্যুত্তম

গ্রন্থ লেখেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনমত আমরা এই পুস্তকখানির সদ্ব্যবহার করব।

তারও তিন শত বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ফার্সীতে রচনা করেন তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক, 'তুহাফতু অল্-মুওয়াহ্-হিদীন' : 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ'। রাজা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর পুস্তককে 'ত্রিরত্ন'ধারী বা ত্রিপিটক বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন তাঁরাই জানেন রাজার শিক্ষাদীক্ষা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নিকট কতখানি ঋণী এবং পরবর্তী জীবনে যদিও তিনি উপনিষদের উপর তাঁর ধর্মসংস্কারসৌধের দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তবু শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কণামাত্র হ্রাস পায় নি। প্রয়োজনমত আমরা তাঁর রচনাবলীরও সদ্ব্যবহার করব।

প্রায় ছশ বৎসর ধরে এ দেশে ফার্সীচর্চা হল। হিন্দুরা না হয় বিদেশাগত ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল না দেখাতে পারেন, কিন্তু যাদের রাজ্যচালনা করতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে এ দেশের ভাষা রীতিনীতি অল্পবিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তম সরকারি কর্ম পাবার জন্য বহু হিন্দুও ফার্সী শিখেছিলেন। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে : এ দেশে বহু হিন্দুর পদবী মুন্‌শী। আমরা বাংলায় বলি, লোকটির ভাষায় মুন্সিয়ানা বা মুন্‌শীয়ানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর (স্কিলফুল) ভাষা লেখে। এর থেকেই বোঝা যায়, কতখানি ফার্সী জানা থাকলে তবে মানুষ বিদেশী ভাষায় এ রকম একটা উপাধি পায়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে : আমরা প্রচুর ইংরিজি চর্চা করেছি, কিন্তু ইংরেজ মুন্‌শী-জাতীয় কোনো উপাধি আমাদের কাউকে দেয় নি—বরঞ্চ আমাদের 'ব্যাবু-ইংলিশ' নিয়ে ব্যঙ্গই করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা পরে হবে,

উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মুন্শী-শ্রেণীর যাঁরা উত্তম ফার্সী শিখেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কৃতের পটভূমি তাঁদের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাস্ত্রের সম্মেলন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু এঁরা ফার্সী শিখেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য—জ্ঞানান্বেষণে নয়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরিজি বিদ্যাভ্যাস করেছি বটে, তথাপি খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভব করেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য বাংলা দেশে আসার সময় পথিমধ্যে এক মোল্লার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই মোল্লা নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তখন মুসলমান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ভ্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না। মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা তথা মিথ্যাচারণ বর্জন করে সৎপথে চলে—অর্থাৎ কুরান-শরীফ-বর্ণিত নীতিপথে চলে—তাকে 'পয়গম্বর-হীন' মুসলমান বলা যেতে পারে, হজরৎ মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করে নি বলেই সে ধর্মহীন নয়। (আমরা এস্থলে 'কাফির' না বলে 'ধর্মহীন' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি, পরে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে)। অতএব অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় যে, বোধ হয় চৈতন্যদেব ঐ মতবাদেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তদুপরি চৈতন্যদেবের মত উদার প্রকৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে হজরৎ মুহম্মদকে অন্যতম মহাপুরুষ বা পয়গম্বররূপেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুত সে যুগে, এবং এ যুগেও বহু হিন্দু সজ্জন মহাপুরুষ মুহম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা, কাজী-কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ করা নিয়ে। কথিত

আছে, সেবারেও তিনি যুক্তিতর্কে কাজীকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অনুমান এস্থলেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।

তবুও এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এ যাবৎ আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমান যে-জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান হন নি। এবং বিদেশাগত পণ্ডিত দার্শনিক এ দেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলাভের উদ্দেশ্যে—কারণ অধিকাংশই ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তের পর এঁদের অধিকাংশ তাঁদের চরম নিমকহারামীর পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চমুখে এ দেশের নিন্দাবাদ করে। নিন্দা করেছেন মুসলমান রাজা এবং আমীর-ওম্‌রাহেরই—হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।

ফার্সী সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন উপরে উল্লিখিত যুগকে ফার্সী সাহিত্যের 'ইণ্ডিয়ান সামার' 'পুনরুচ্ছলিত যৌবন' নাম দিয়েছেন। বস্তুত বর্বর মঙ্গোল অভিযানের ফলস্বরূপ ফার্সী সাহিত্যের যে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল সে তখন অন্নজল পায় মোগল-দরবারে। ইরান আজকের দিনে ভারতের কাছে তার জন্য কতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছয়

না, কিন্তু ভারতবর্ষে ফার্সী সাহিত্যের এই যুগ নিয়ে অতি অল্প আলোচনাই হয়েছে, তাও উর্দুতে, বাংলাতে কিছুই হয় নি।

এ তো প্রধানত সাহিত্য ও অন্যান্য বাঙ্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মনে হয় এই দেখে যে, ভুবনবিখ্যাত ষড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্লাতো-আরিস্তল, সিনা-রুশ্‌দ্‌ নিয়ে সপ্তম দর্শন নির্মাণ করল না। কল্পনা করতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়—ভারতবর্ষ তা হলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিক্‌চক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে যেত—দেকার্ত কান্টের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক এ-দেশেই জন্মাতেন!

পক্ষান্তরে মুসলমান যে-আরবী দর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মূররা বিতাড়িত হওয়ার ফলে আরব-জগতে দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এ দেশের মুসলমান দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাইরের সর্ব উৎস সম্পূর্ণ শুষ্ক হল। হায়, এঁরা যদি পাকে-চক্রে কোনো গতিকে ষড়দর্শনের সন্ধান পেতেন!

এ তো কিছু অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক একদিকে নব্যন্যায় চর্চা করেন, অন্য দিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের পথ-প্রদর্শক। কবি ইক্‌বালের ঐতিহ্যভূমি আভেরস-আভেচেন্নার উপর—তাঁর সৌধনির্মাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কাণ্ট-হেগেলের।

আমরা এতক্ষণ যে অবস্থার বর্ণনা করলেম তার থেকে আপাত-দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত নয় যে, ভারতবর্ষে তা হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় নি। যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেন নি তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আপন শাস্ত্র চর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাজিলরা ওয়াক্‌ফ্‌-সম্পত্তি পেয়ে

গেলেন তাই তাঁরাও পরমানন্দে তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান-হদীসের চর্চা করে যেতে লাগলেন। একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ওয়াক্ফ্-সম্পত্তি নেই। চাষা তিলী জোলা কাঁসারী মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈদ্য কারকূন এবং অন্যান্য শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়। সে স্থলে হিন্দু মুসলমানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মুসলমানকেও হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হয়। তদুপরি উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা সংগীত স্থাপত্য বাদশা ও তাঁর অর্থশালী আমীর-ওমরাহের সাহায্য বিনা হয় না। বাদশারও দরকার হিন্দু রাজ-কর্মচারীর। কোনো দেশ জয় করা এক কর্ম, সে দেশ শাসন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া। বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিগ্বিজয় করার সময় রাজকর্মচারী সঙ্গে আনেন নি। আর আনবেনই বা কি? তারা এ-দেশের ভাষা জানে না, রাজস্বব্যবস্থা বোঝে না, কোন্ দণ্ডনীতি কঠোর আর কোন্টাই বা অতি সদয় বলে দেশের লোকের মনে হবে—এ সম্বন্ধে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বখ্শী (চীফ পে-মাস্টার, অ্যাকাউণ্টেন্ট্-কম্-অডিটার জেনরেল), কানুন্গো (লিগেল রিমেম্ব্রেন্সার), সরকার (চীফ সেক্রেটারি), মুন্শী (হুজুরের ফরমান লিখনেওলা, নূতন আইন নির্মাণের খসড়া প্রস্তুতকারী), ওয়াকে'-নওয়ীস্ (যার থেকে Waqnis), পর্চা-নওয়ীস (রাজকর্মচারীর আচরণ তথা দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করনেওলা) এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কারা?

আমরা জানি, কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে এসব কাজ করে আসছেন। এঁরাই এগিয়ে এলেন। মুসলমানপ্রাধান্য প্রায় দু শ বৎসর হল লোপ পেয়েছে, কিন্তু আজও এসব পদবী—প্রধানতঃ কায়স্থদের ভিতর—সম্পূর্ণ লোপ পায় নি।

এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য বহু জিনিস যে হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন।

শুধু ভাস্কর্য ও নাট্যকলা বাদশা-আমীর-ওমরার কোনো সাহায্য পায়নি। তার কারণ, ইসলামে মূর্তিনির্মাণ নিষিদ্ধ এবং নাট্যকলা ভারতের বাইরে মুসলিম জগতে সম্পূর্ণ অজানা।

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 'এসো, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পারে সেটা কারো মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে।

এ পন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদূ নানক ইত্যাদি। পরম শ্লাঘার বিষয়, শান্তিনিকেতনেই এঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এত দিন ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান গুণী-জ্ঞানীরা যেসব মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেই সে-সময়ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী তাঁদের নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করেন। তাঁর 'দাদূ' 'কবীরে'র পরিচয় এস্থলে নূতন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

সে পুণ্যকর্ম এখনো বিশ্বভারতীতে পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধবয়সের সহকর্মী বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত রামপূজন তিওয়ারীর 'সূফীমত-সাধনা ঔর সাহিত্য' সুচিন্তিত স্বয়ং-

সম্পূর্ণ পুস্তক হিন্দী সাহিত্য তথা মধ্যযুগীয় লোকায়ত ধর্ম-চর্চার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরণের গ্রন্থ সর্ব ভাষায়ই বিরল।

কিন্তু চিন্তাজগতে—দর্শন-ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞানবিজ্ঞানে—হিন্দু-মুসলমানের মিলনাভাব, অথচ অনুভূতির ক্ষেত্রে—চারুকলা সঙ্গীত লোকসাহিত্যে গণধর্মে—আশাতীত মিলন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা করতে হলে উভয় জনসমাজের মূলধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার গোড়া থেকে অধ্যয়ন করতে হয়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই নেই। যা-কিছু আছে তা সরল ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং স্বধর্মবিশ্বাসীর হৃদয়-মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য—বিধর্মীর সম্মুখে আপন ধর্ম যুক্তিবিচারের উপর নির্মাণ করে তাকে আকর্ষণ করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ নীতিও যে বিধর্মীর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হতে পারে সে দুশ্চিন্তাও এ-সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করে নি। উপরন্তু ইংরেজ-আগমনের পর এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক বিকট বিকৃত রূপ। সরল হিন্দু জানত না, খ্রীষ্টান এবং মুসলিমে স্বার্থে সংঘাত লেগে যায় মহাপুরুষের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই, শত শত বৎসর ক্রুসেডের নামে একে অন্যের মরণালিঙ্গনে তারা সম্পিষ্ট; ফলে খ্রীষ্টান কর্তৃক ইসলাম ও হজরৎ মুহম্মদের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক্য এ দেশে এসেছে 'নিরপেক্ষ গবেষণার' ছদ্মবেশ ধরে। সাধারণ সরল হিন্দু এ ছদ্মবেশ বুঝতে পারে নি। (এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুসলমান কিন্তু খ্রীষ্টানকে প্রাণভরে 'জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারে নি, কারণ কুরান-শরীফ যীশুখ্রীষ্টকে অন্যান্য মহাপুরুষদের একজন বলে যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি মুহম্মদের পূর্বে সর্বপ্রধান

পয়গম্বর বলে তাঁকে বিশেষ করে 'রূহুল্লা' 'আল্লার আত্মা' 'পরমাত্মার খণ্ডাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান যুগ যুগ ধরে হজরৎ মুহম্মদকে 'ফল্‌স্‌ প্রফেট' 'শার্লট্যান' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও 'ঐতিহাসিক' ওয়েল্‌স্‌ তাঁর 'বিশ্ব-ইতিহাসে' মুহম্মদ যে ঐশী অনুপ্রেরণার সময় স্বেদসিক্ত বেপথুবান হতেন তাকে মৃগীরুগীর লক্ষণ বলে মহাপুরুষকে উভয়ার্থে লাঞ্ছিত করেছেন)।

রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সর্বদেশেই বিরল। এ দেশে তো অবশ্যই।

ইতিমধ্যে আর-একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

এতদিন যে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মুসলমানের ধর্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন নি তাতে হয়তো তাঁদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি, কিন্তু স্বরাজলাভের পর তাঁদের সে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্থান ইরান ইরাক সিরিয়া সউদী-আরব ইয়েমেন মিশর তুনিস আলজীরিয়া মরক্কো তথা মুসলমানপ্রধান ইন্দোনেশিয়া ও নবজাগ্রত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা স্থাপনা করতে হবে। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানও এ ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত। এদের ধর্ম, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বাতাবরণ-পার্থক্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্তন—এসব এখন অল্পবিস্তর অধ্যয়ন না করে গত্যন্তর নেই। সত্য, আমাদের ইস্কুল-কলেজে এখনো আরবী-ফার্সীর চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পায় নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন হবে না। কিছু কিছু হিন্দুদেরও আরবী-ফার্সী শিখতে হবে। এবং এই সাত শ বৎসরের প্রাচীন আরবী-ফার্সীর শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যতই প্রয়োজনীয় হোক, এস্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর।

আমরা যে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্য আজ আর প্রাচীন মানচিত্র কাজে লাগবে না। ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথবা সন্দেহে সন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করলে আজ আর চলে না। ধর্মকেও আজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করতে হয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে থাকবে সহানুভূতিশীল হৃদয়॥

পরিচিতি

কিছুদিন পর পরই নূতন করে আলোচনা হয়—এখনো লোকে মপাসাঁ পড়ে কিনা, পড়লে কারা পড়ে? ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ? ফ্রান্সের লোকের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। তারা অল্পবিস্তর সব সময়ই পড়বে। উপস্থিত শুনতে পাই, মার্কিন দেশেই নাকি তাঁর সব চেয়ে বেশী কদর। যাঁরা এসব আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যগুলোর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন বলে সেগুলোকে হিসেবেই নেন না। আমার জানা মতে আরব দেশে এখনো তাঁর প্রচুর সম্মান; তার অন্যতম কারণ আরবী প্রচলিত মিশর থেকে বাইরুৎ-দামাস্কস পর্যন্ত ফরাসীর প্রচলন ইংরিজির তুলনায় বেশী। অধুনা মার্কিনি ভাষা ঐসব দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করছে, কিন্তু তাতে মপাসাঁর কোনো ক্ষতি হবে না; কারণ, পূর্বেই নিবেদন করেছি, মার্কিনজাত মপাসাঁ-ভক্ত।

তা সে যা-ই হোক, ফ্রান্সের বাইরে কিন্তু তাঁর রচনা (essays) নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা হতে দেখিনি। এ যেন অনেকটা কনান ডয়েলের মত। তাঁর শার্লক হোম্‌স নিয়ে সবাই এমনই মুগ্ধ যে তাঁর অন্যান্য লেখার দিকে কেউই বড় একটা নজর দেন না। শার্লক হোম্‌সে এমনই ঝাল যে তার পর বাকি তাবৎ রান্না অতিশয় সুনিপুণ হলেও ফিকে বলে মনে হয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে মপাসাঁর প্রবন্ধ তার ছোট-গল্পকে হার মানায়। বস্তুত তাঁর সর্বোত্তম উপন্যাসদ্বয়ই—'য়্যুন্ ভী' এবং 'বেল্ আমি'[১]—তাঁর ছোট গল্পকে হার মানাতে পারে নি।

১ অনেকেরই বিশ্বাস, যেহেতু মপাসাঁ মেয়েদের 'ইটার্নেল হার্লট' বলেছেন তাই পুরুষদের তিনি খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। বস্তুত 'বেল আমি' পড়ার পর পুরুষকুলকেও 'ইটার্নেল জিগলো' (পুং বেশ্যা) বলা যেতে পারে। তবে যৌনক্ষুধাতুর মপাসাঁ স্বভাবতই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বেশী এবং তাদের সম্বন্ধেই লিখেছেন বেশী।

তাঁর নাট্য ও কবিতাও নিম্নাঙ্গের। পক্ষান্তরে চেখফ্ ছোটগল্প এবং নাটক, উভয়েই অদ্বিতীয়।

আমার নিজের মনে হয়, মপাসাঁর প্রবন্ধগুলি অত্যুত্তম। তাঁর গুরু ফ্লোবের ও গুরুসম—ফ্লোবেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু—তুর্গেনিয়েফ্ সম্বন্ধে তিনি যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি অতুলনীয়। মপাসাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাসে পাঠক পাবেন দেহ ও যৌন ক্ষুধার ছড়াছড়ি কিন্তু সত্যকার্ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা, কিংবা সে-শ্রদ্ধার প্রতি সহানুভূতি, অথবা স্নেহের প্রতি অনুরাগ, মানুষের এসব তাবৎ মহামূল্যবান বৈভবের প্রতি মপাসাঁর কোনো আকর্ষণ নেই—তিনি যা চান তাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন বলে যখন এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তখন সেগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁর যাদুকাঠির পরশ দিয়েই কিন্তু তখন তাঁর উদ্দেশ্য অন্য, ঐ সব বৈভবকে সম্মান দেখানো নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্যাডিং রূপে। অথচ আমরা জানি মপাসাঁ তাঁর মাকে ভালোবাসতেন গভীররূপে—বস্তুত এ-রকম মাতৃভক্ত পুত্র সর্বকালেই সর্বদেশেই বিরল—যে-লোক প্রতিদিন ভালো-মন্দ-মাঝারি, ডাচেস থেকে স্বৈরিণী পর্যন্ত বিচরণ করে, আপন ফুর্তির জন্য কাঁড়া কাঁড়া টাকা ছড়ায়, হেন দুষ্কর্ম নেই যা তার অজানা এবং যার জন্য সে পয়সা খর্চা করতে রাজী নয়—সেই লোক ঠিক নিয়মিত মাকে মোটা টাকা পাঠায়, নিয়মিত মধুর চিঠি লেখে, পাছে মা টের পেয়ে যান তাই অতিশয় অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রাচীন প্রথামত নববর্ষের পরব রাখতে গাঁয়ে মায়ের বাড়িতে যায় (তার পাঁচ দিন পরই তাঁর মাথার ব্যামো—সিফিলিসজনিত উন্মাদরোগ—তাঁকে এমনি বিভ্রান্ত করে যে তিনি ছুরি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা দেন; অনুগত ভৃত্য ফ্রাঁসোয় পিস্তলের গুলি আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় সরিয়ে রেখেছিল) সে যে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্মান দিত না, এ তো হতেই পারে না।

শুধু তাই নয়, সেই শ্রদ্ধার 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন ফ্লোবের ও তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লিখিত মপাসাঁর প্রবন্ধে।

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি অন্য দেশ কতখানি সম্মান দেয়, আমার জানা নেই। তবে রুশ দেশ তাঁর চরম সম্মান দেয় ও দিয়েছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফের মৃত্যুর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হলে সারা রুশদেশব্যাপী তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তুর্গেনিয়েফের ভাইয়ের মেয়ে (কিংবা আপন জারজ, পরে আইনসম্মত কন্যা) দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেন তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে মপাসাঁর প্রশংসাকীর্তন নিয়ে। তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে রুশদেশ এবং রুশ দেশের বাইরে বিস্তর প্রবন্ধ বের হয়েছে (এবং আশ্চর্য, মপাসাঁ যখন তাঁর খ্যাতির চরমে, যখন তাঁর ছোট গল্প ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তখন তিনি খ্যাতির পান নি এক রুশ দেশে, যদিও রুশ দেশ সব সময়ই ফ্রান্স-পাগল, কারণ রুশে তখন তলস্তয়, তুর্গেনিয়েফ, লেস্‌কফ[২], দস্তয়েফ্‌স্কি, চেখফ কেউ বা তাঁর বিজয়শঙ্খ বাজাচ্ছেন বিপুল বিক্রমে, কারো বাণী দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কারো বা মধুর কণ্ঠের প্রথম কাকলি দেশের সর্বত্র নবীন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে—মপাসাঁকে লক্ষ্য করবার ফুর্সৎ তাদের নেই) কিন্তু ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের প্রতিভূ স্মরণ করলেন মপাসাঁকে—সেই মপাসাঁ যাঁর প্রবন্ধ পৃথিবীর সর্বত্র অপরিচিত।[৩]

---

২ লেস্‌কফের একটি দীর্ঘ গল্প আমি অনুবাদ করেছি, বিশ্বসাহিত্যে এ গল্পটি অতুলনীয় ব'লে—যদিও আমি পাঁচটা বাবদের ন্যায় এটাতেও অক্ষম। একাধিক গুণীকে অনুরোধ করার পরও তাঁরা যখন সেটি অবহেলা করলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই করতে হল। 'প্রেম' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩ মপাসাঁর এই প্রবন্ধটি আমি অনুবাদ করি একই সময়ে—পঁচাত্তর বৎসরের পরব উপলক্ষ্যে।

তাই বলছিলুম, মপাসাঁর 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন এ-ছুটি প্রবন্ধে এবং তাঁর অন্যান্য রচনায়। মানুষ মপাসাঁকে চেনবার ঐ একমাত্র উপায়। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা মপাসাঁ বন্ধুদের সঙ্গে তো করতেনই না, লেখাতে যা করেছেন তাও পঞ্চাশ লাইনের বেশী হয় কি না হয়।

আর আছে তাঁর চিঠি। কিন্তু সেগুলোতেও তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ব্যথা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিরব। তার কারণ, গুরু ফ্লোবের কর্তৃক জর্জ সান্‌ড্‌কে লেখা তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠি যখন ছাপাতে প্রকাশিত হয়, তখন ফ্রান্সের মত দেশেও তাই নিয়ে তুল-কালাম কাণ্ড ঘটে। মপাসাঁ তখনই সাবধান হয়ে যান। পারলে মপাসাঁ ফ্লোবেরের চিঠিগুলো প্রকাশিত হতে দিতেন না। শেষটায় যখন দেখলেন প্রকাশ হবেই হবে তখন মপাসাঁ সে সংকলনের ভূমিকা লিখতে রাজী হন। তিনি আশা করেছিলেন গুরুর পদতলে তাঁর শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন দেশেব পাঁচজনকে বুঝিয়ে দেবে, ফ্লোবেরকে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে দেখে তাঁর সত্য মূল্য দিতে হয়।

তবুও মপাসাঁর চিঠিগুলো যে অমূল্য, তুলনাহীন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার জানামতে তাঁর সর্বশেষ চিঠি তাঁর ডাক্তারকে লেখা— এইটি সর্বশেষ না হলেও এটিতে পাঠক পাবেন 'রাজহংসের মরণগীতি।'

তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার আঁরি কাজালি (জঁা লাওর)-কে লিখিত,

"কান্, ইজের কুটির।

আমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। তারও বেশী। আমি এখন মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায়। নাকের ভিতর নোনা জলে ঢেলে সেটা ধুয়েছিলুম বলে তারই ফলে আমার মগজ নরম হয়ে গিয়েছে। সেই

মুন মাথার ভিতর গাঁজিয়ে ওঠায় (ফের্মাতাসিয়োঁ—ফার্মেন্‌টেশন্) সমস্ত রাত ধরে আমার মগজ গলে গিয়ে চ্যাটচেটে পেস্টের মত নাক আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ হচ্ছে আসন্ন মৃত্যু, আর আমি উন্মাদ।[৪] আমি প্রলাপ বকছি। শেষ-বিদায় বন্ধু, বিদায়! তুমি আমাকে আবার দেখতে পাবে না……"[৫]

আমি ডাক্তার নই, তাই বলতে পারবো না, মানুষের জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরও তার নাক কান দিয়ে মগজ গলে বেরয় কি না, মুনের ফার্মেণ্টেশন হয় কিনা তাও জানিনে। স্পষ্টতঃ এ চিঠি উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু প্রশ্ন, উন্মাদ কি স্বীকার করে সে প্রলাপ বকছে?

* * *

ফরাসী ভাষায় মপাসাঁর দু'খানি অত্যুত্তম রচনা ও পত্রসংগ্রহ আছে। ইংরিজিতে এগুলোর অনুবাদ হয়েছে কি না জানিনে।

(১) CHRONIQUES, ETUDES, CORRESPONDANCE
DE GUY DE MAUPASSANT
Recueillies, Prefacees et Annotees par
RENE DUMESNIL
avec la collaboration de Jean Loize
et publiees pour la premiere fois avec nombreux
DOCUMENTS INEDITS
LIBRAIRIE GRUEND, 60, RUE MAZARINE, 60,
PARIS, VI, 1938

(২) CORRESPONDANCE INEDITE
DE
GUY DE MAUPASSANT
Recueillie et presentee par

৪ ৫ এই দুটি ছত্র ক্যাপিটাল অক্ষরে।

ARTINE ARTINIAN
avec la collaboration d'
EDOURAD MAYNIAL
Editions Dominique Wapler,
6, Rue de Londres,
Paris, 1951

বছর কুড়ি পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা নানা দেশের চুয়াত্তর জন খ্যাতনামা লেখককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কোন্ লেখক তাঁদের সৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। উত্তরে মপাসাঁ—জর্মন কবি হাইনে, এবং হোমার ও হুইট্‌মানের সমান সম্মান পান এবং ইব্‌সেন ও স্তাঁদালের চেয়ে বেশী।

এদেশেও মপাসাঁ নিয়ে কৌতূহল আছে।

কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অধুনা লিখিত সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বলিত সাহিত্যালোচনার একখানা অত্যুত্তম পুস্তক আমার হাতে এসে পৌঁছল। 'সোনার আল্‌পনা' (এভারেস্ট বুক হাউস, ১৯৬০)।

বইখানিতে অন্যান্য মনোরম প্রবন্ধের ভিতর গী দ্য মপাসাঁ ও ইভান তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধেও দুটি রচনা রয়েছে।

আজকাল এদেশে অনেকেই ফরাসী শিখছেন। উপরের দুখানা মূল গ্রন্থ ও বাঙলা বইখানা নিয়ে আলোচনা হলে বাঙলা সাহিত্য উপকৃত হবে॥

হতভাগ্য কাছাড়

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এতদিন পরে সেই পুরোনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন ? কাছাড়ীতেও আছে,

স্বামী মরলো সন্ধ্যা রাত !
কেঁদে উঠলো দুপুর রাত !!

(খাস কাছাড়ীতে লিখলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে 'সংস্কৃত' করা হল।)

আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে—অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী (তাদের ভিতরেও হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে), নাগা, লুসাই এবং আরো কত যে জাত-বেজাত কাছাড়ে সখ্যভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তখন আমার জানা ছিল, এ আন্দোলন বেশীদিন চলবে না, একটা রফারফি হয়ে যাবেই, এবং তারপর কাছাড়বাসীরা ভাষার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে আবার সুখ-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে। পারি যদি তখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করবো। সর্বত্রই দেখেছি, পাকা বুনিয়াদ, গঠনের কাজ আরম্ভ হয় তখনই।

*　　　　*　　　　*

কাছাড়ের উত্তর, পুব, দক্ষিণে পাহাড়। তার বেরবার পথ মাত্র পশ্চিম দিকে—পুব পাকিস্তানের সিলেটের ভিতর দিয়ে। সে পথ আজ বন্ধ। হিল্ সেকশন নামক যে রেলপথটি কাছাড়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র

উপত্যকার চা চট্টগ্রাম বন্দর তথা চাঁদপুর হয়ে কলকাতার বন্দরে পাঠাবার জন্য। ওটা কখনো কাছাড়ীদের বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি।

এর পূর্বে বলে রাখা ভালো, কাছাড় ঐতিহ্যহীন দেশ নয়। সিলেট-কাছাড়ের ঐতিহ্য এক সঙ্গে জড়িত ছিল বলে এতদিন ধরে সবাই 'সিলেট সিলেট' করেছে এবং কাছাড় তারই তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাড়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আর্য-সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি। এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ। এর পরই মণিপুর—এঁরা বৈষ্ণব হলেও এদের রক্ত এবং ভাষা ভিন্ন। তারপর বর্মা। এবং আর্যসভ্যতা বাদ দিয়েও কাছাড়ের প্রাচীন আদিম-বাসীরাও আপন সভ্যতা নির্মাণ করে গিয়েছেন—তার নিদর্শন আজও কাছাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষা গ্রহণ করেন।[১] বস্তুত জয়ন্তিয়া (পাঠন-মোগল কেউই এ রাজ্য অধিকার করতে পারেন নি), ত্রিপুরা, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহম রাজারাই আসাম প্রদেশের চারিটি প্রধান রাজবংশ। আমার যতদূর জানা আছে, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার সময় কাছাড়কেই কেন্দ্রভূমি করে সে কর্ম করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কাছাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যাঁরা হিল সেকশন দিয়ে রেলেও গিয়েছেন মাত্র, তাঁরাও এ বাবদে আমার মতে সায় দেবেন।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাছাড়ে জমিদাররা কখনো দাবড়ে বেড়ান নি বলে সেখানকার সমাজে অতি সুন্দর গণতন্ত্র প্রচলিত। জমিদার নেই বলে লেঠেলও ছিল না। তাই কাছাড়ীরা বড় শান্ত,

১ সৈয়দ মরতুজা আলী, A History of Jaintia, ও এঁর লেখা ঐ যুগের আসাম ও বাঙলার চার রাজবংশের মধ্যে বাঙলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নিরীহ। এমন কি সোনাই অঞ্চলে যেসব নাগারা বাস করে তারাও মাঝে-মধ্যে বাঙালী জনপদবাসীর কুকুর ধরে নিয়ে ভোজ-দাওয়াৎ করলেও এরা দা হাতে করে মানুষের মুণ্ডুর সন্ধানে বেরোয় না।

দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র, কিংবা লক্ষাধিক শরণার্থীকে কাছাড় আশ্রয় দিয়েছে সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। 'পূর্ব-বঙ্গের রেফুইজী'-দের আশ্রয় দেওয়ার প্রায় পুরো ক্রেডিট্ নেন পশ্চিম বাঙলা। শিলঙে অবস্থিত অহমিয়া সরকার 'বঙাল' কাছাড়ের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যে অত্যধিক লম্ফঝম্ফ করবেন না সে তো বেদ থেকে পাঁচকড়ি দে তক্ স্বর্ণাক্ষরে লেখা—আমিও দোষ দি নে।

বস্তুত চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখলো তার খতিয়ান হওয়া উচিত। অথচ দেশ বিভাগের ফলে কাছাড়ের সর্বনাশ হয়েছে। তার ধনদৌলত, ধান, কাঠ, ছন, বাঁশ, চা প্রাকৃতিক আরো নানা সম্পদ সবই পাঠানো হত সিলেটের মাঝখান দিয়ে। আজ সে পথ বন্ধ। পূর্বেই বলেছি, তার তিন দিকে পাহাড়। ছিল সেকশন দিয়ে যে খর্চা পড়বে তার অর্ধেক মূল্যে এসব বস্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

দেশ বিভাগের পূর্বে কাছাড়-শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুর্মা-উপত্যকা আসাম রাজ্যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ হয়ে গেল নগণ্যাধম মাইনরিটি—এবং যেটুকু তার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তাও সে পেল না—সেনসাস নিয়ে কারসাজি করার ফলে।[২]

---

২ আমার অগ্রজ পূর্বোল্লিখিত সৈয়দ মরতুজা আলী আসামে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাকে ১৯৪১ সালেই (!) বলেন যে সেনসাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

ইউনাইটেড নেশনস বলেন, তাঁদের প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর সর্বত্র মাইনরিটি নিয়ে। কাজেই আজ যদি অসমীয়ারা কাছাড়বাসীর মাতৃভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমীয়া চালাতে চান তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য সেটা যে অন্যায় সে-কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কাছাড়ীরা বাঙলা ভাষা ও তাদের বাঙালী ঐতিহ্য কখনো ছাড়তে পারবে না—অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।

ভাষার উপর এ অত্যাচার নূতন নয়।

এর বিরুদ্ধে ঔষধ কি ?

অধম আকাশ-বাণীকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শিলচরে একটি বেতার কেন্দ্র হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কারণ কলকাতার আকাশবাণী সেখানে ভালো করে পৌঁছয় না। গৌহাটি কেন্দ্রের ভাষা অসমীয়া। ওদিকে আরেকটি মজার জিনিস। গৌহাটি কেন্দ্র নাগাকে শান্ত করার জন্য সেখান থেকে প্রচারকার্য করেন। আশ্চর্য হই, তাঁরা 'আর্তিস্ত' পান কোথায় ? প্রথমত টেপ-রেকর্ডার নিয়ে নাগা আঞ্চলে ঢোকা অনেকখানি হিম্মতের কাজ, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র টেপ-রেকর্ডারের জোরে প্রচারকার্য চলে না। পক্ষান্তরে খাস কাছাড়েই মেলা নাগা রয়েছেন। মাঝখানে পাহাড় আছে বলে গৌহাটির বেতার-গলা নাগা পাহাড়ে ভালো করে পৌঁছয় না। ওদিকে নাগা পাহাড় কাছাড়ের প্রতিবেশী।

কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। লুসাইরা নিরীহ। কিন্তু অহমিয়ারা যেভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাতে কখন কি হয় বলা যায় না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। লুসাইদের সর্ব আমদানি-রপ্তানি একমাত্র কাছাড়ের সঙ্গে। লুসাইদের জন্য

প্রচারকর্ম করার জন্য শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র—গৌহাটি বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য কোনো স্থল নয়।

আরো নানা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ আছে। স্থানাভাব।

শিলচরে এই বেতার কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তীব্রকণ্ঠে দাবি জানাতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসাম সরকার সাহায্য করবেন না। বাধা দিলে আমি আশ্চর্য হব না, দোষও দেব না।

কিন্তু এ তো বহুবিধ আশ্চর্য তথ্যের মধ্যে সামান্য জিনিস।

আমার মনে পড়ছে, অস্ট্রিয়ার রাজা হাঙ্গেরির ভাষা নিধন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বুদাপেস্তের হাঙ্গেরীয় স্টেজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোধ হয় রাজা আপন পায়ে কুড়োল মারলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে পড়ল জিপসি ক্যারাভানে—শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা এমনি ভাষার বান জাগিয়ে তুললে যে, সমস্ত দেশ মনে প্রাণে অনুভব করলো, মাতৃভাষা মানুষের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য ঐ তার একমাত্র গতি। যে-সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়—সে তার মাতৃভাষা।

এই তার সময়। ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাসের দুর্দিনে গড়ার কাজ করা যায় না। সে যেন আতসবাজি। সেটা শেষ হলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তার পূর্বেই ওরই ক্ষুদ্র শিখা দিয়ে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হয়।

* * *

এই তার সময়। রাজদণ্ডের ভয় নেই, রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কারসাজি নেই—শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা

করতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কি প্রকারে মাতৃভাষার গৌরব সম্বন্ধে সর্ব কাছাড়বাসীকে পরিপূর্ণ সচেতন করা যায়।

সেই চৈতন্যের উপরই মাতৃভাষার দৃঢ়ভূমি নির্মিত হবে।

তাই যখন আবার বিপদ আসবে তখন উন্মাদের মত দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে হবে না, ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে মাইকে চিৎকার করতে হবে না। গ্রামের লোক নিজের থেকেই সাড়া দেবে। শহরে সীমাবদ্ধ যে-কোনো আন্দোলনই সহজে দমন করা যায়। কিন্তু সে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দমন করা অসম্ভব।

এই তার সময়। চিন্তা করুন, গ্রামে গ্রামে কি প্রকারে সে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করতে পারি।

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এ আন্দোলন শান্তিময় গঠনমূলক। এতে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। এবং সবচেয়ে শেষের বড় কথা—এ গঠন-কর্ম অগ্রসর হবে অহমিয়া ভ্রাতা, তথা কাছাড়ের কোনো সম্প্রদায় বা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি বৈরীভাব না রেখে॥[৩]

৩ অমিতাভ চৌধুরী, মুখের ভাষা বুকের রুধির।

নেতাজী

আজ—এবং নেতাজী।

এ পৃথিবীতে ভারতের মত অতখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর নেই। এবং সে-জন্য যে আমরা ক্যাপিটালিস্ট কম্যুনিস্ট উভয় পক্ষেরই বিরাগভাজন হয়েছি তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিক জীবন লক্ষ্য করলেই এ তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে-মানুষ দলাদলির মাঝখানে যেতে চায় না—তা সে স্বভাবে শান্তিপ্রিয় বলেই হোক, আর দুই দলের গোঁড়ামিই তার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয় বলেই হোক—সে উভয় দলেরই গালাগালি খায়।

তাই পাঁড় কম্যুনিস্টরা আমাদের টিটকারি দিয়ে বলছে, 'যাও, করোগে পীরিত ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে; এখন বোঝো ঠ্যালা।' আর পাঁড় ক্যাপিটালিস্টরা বলছে ঠিক এই একই কথা। আমরা নাকি কম্যুনিস্টদের গলায় পীরিতির মালা পরাতে গিয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা।

পুরোপাক্কা সুস্থমস্তিষ্ক নিরপেক্ষ জন পাই কোথা যে তার মতটা জেনে নিয়ে আপন চিন্তা-ধারা আপন আচরণের বাছ-বিচার করি, জমা-খরচ নিই।

তবে পৃথিবীর লোক সচরাচর বলে থাকে সুইজারল্যাণ্ড নাকি বড় নিরপেক্ষ দেশ। আমার মনে হয়, লোকে তাকে যতটা নিরপেক্ষ মনে করে ঠিক ততটা সে নয়। তবু সবাই যখন এ-কথা বলছেন তখন সুইসদের মধ্যে যাঁরা সচরাচর লিব্‌রেল উদার প্রকৃতি-সম্পন্ন বলে গণ্য (সব সুইসই যে সমান নিরপেক্ষ এ কথা সত্য হতে পারে না) তাঁদের মতটা শোনা যাক।

এঁরা প্রথমেই বলেন, চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে এটা তার লাওস, ভিয়েটনাম বা কোরিয়াতে লড়াইয়ের মত নয়। ওসব জায়গায় সে লড়ে কম্যুনিজ্‌ম ধর্মকে 'কাফের' ক্যাপিটালিস্ট-ইম্‌পিরিয়ালিস্টদের অযথা আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য (ভারতবর্ষ আক্রমণে সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, কারণ এ-কথা কেউ বলতে পারবে না যে কম্যুনিজম-ধর্মবিশ্বাসী কম্যুনিস্টদের আমরা নির্যাতন করে করে নিঃশেষ করে আনছিলুম, বরঞ্চ বলবো ওদের প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে বলে ঘরে বাইরে অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন), এ-স্থলে চীন ভারত আক্রমণ করেছে নিছক রাজ্যজয়ার্থে।

আমরাও বলি তাই, যদিও অন্য একাধিক কারণ থাকতে পারে।

এর পর সুইস লেখক বলছেন, এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি ?

(১) ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়-ঐক্য রুদ্র জাগ্রতরূপ ধারণ করেছে এবং

(২) যে কম্যুনিজমের প্রতি এতদিন সে উদাসীন এবং সহিষ্ণু ছিল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে।

(৩) বিশ্বজন চীনকেই আক্রমণকারী পররাজ্য লোভী ইম্‌পিরিয়ালিস্ট বলেই ধরে নিয়েছে, কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ জাতিদের মধ্যে ভারতকেই সর্বাগ্রগণ্য বলে শ্রদ্ধা করতেন ও ভারত যে তার দীনদুঃখীর ক্লেশ মোচনের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে সে সত্যও তাঁরা জানতেন (অর্থাৎ চীন যেমন অস্ত্র নির্মাণে আপন শক্তির অপচয় করছিল তা না করে)।

(৪) ভারতীয় কম্যুনিস্টরা পড়েছেন মহাবিপদে (আমার গাঁইয়া ভাষায় ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে) ; হয় তাদের প্রাণের পুত্তলি চৈনিক 'অগ্রগতির' সঙ্গে যোগ দিয়ে, সর্বভারতীয়ের সম্মুখে নিজেদের

দেশদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তারূপে সপ্রকাশ করে, পরিশেষে রাজনৈতিক আত্মহত্যা বরণ করতে হবে, কিংবা চীনের বিপক্ষে, এমন কি শেষমেষ চীনের কম্যুনিস্ট সৎভাই বিশ্বপ্রলেতারিয়ার গুলিস্তান পরীস্তান রুশ —অবশ্য সৎভাই, কারণ সে ছোটভাই চীনকে সাহায্য করতে আদৌ উৎসাহ দেখাচ্ছে না—এমন কি রুশেরও বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে।

(৫) শ্রীযুত খ্রুশফকে হয় বিশ্বজনের সম্মুখে স্বধর্মানুরাগী পীতভ্রাতা চীনের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গ নিতে হবে, কিংবা চীনের পক্ষ নিয়ে ভারত তথা এশো-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

(৬) ভারতকে এখন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রচুর এবং প্রচুরতর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে মৈত্রী বাড়বে, কম্যুনিস্টদের প্রতি বৈরীভাব বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরে তার নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

পাঠক ভাববেন না, আমি সুইসের সঙ্গে একমত। আমিও ভাবছি না যে আপনি সুইসের সঙ্গে দ্বিমত। তবে একটা কথা আমরা উভয়েই মেনে নেব, নিরপেক্ষতা সর্বকালীন সার্বজনীন সার্বভৌম ধর্ম নয়। যদি সত্যিই একদিন আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কোনো বিশেষ নিরীহ দেশ অকারণে বলদৃপ্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তবে আমরা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতা বর্জন করে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষ নেব। মিশর আক্রান্ত হলে পর কমনওয়েলথের সম্মানিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা মিশরের পক্ষ নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য আজ আমরা যে রকম আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠাচ্ছি ঠিক সেই রকম আর্তজনকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষতা বর্জন করে ঠিক সেই রকমই সৈন্য পাঠাবো। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তুং-হিটলার বিশ্বাস করেন, যেখানে জয় সেখানেই ধর্ম।

কিন্তু উপরের ছয় নম্বর বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আমাদের নিরপেক্ষতা বর্জন অবশ্যম্ভাবী নয়। ক্ষণেকের প্রয়োজনে যদি বা আমরা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চিরকালই তৃতীয় পক্ষের কেনা গোলাম হয়ে থাকবো। তার অর্থ এও নয়, আমরা নেমক-হারাম। এবং যাতে করে তৃতীয় পক্ষের বা বিশ্বজনের এ-অন্যায় সন্দেহ না হয়, তাই সাহায্য নেবার পূর্বেই, আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বজনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে।

এই দুঃখের দিনে নেতাজীর কথা মনে পড়ল।

দশ বার বৎসর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আব্দুর রশীদ। এঁদের দুজনাই আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

"তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন আপন যশ ও চরিত্রবল। প্রথম দুজনার স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্য-বাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজারিয়ায় লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালি থেকে বেতারে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগাণ্ডা' করার!

"অথচ সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্মসমাধান করলেন! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতীয় সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

"আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বাহিনী যেন জাপানী ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আব্দুর রশীদ জর্মনিকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও তবে সে-রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয় তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

আজ আমরা স্বাধীন। পৃথিবীতে আমাদের গৌরব আজ অনেক বেশী। নেতাজী বিনাশর্তে সেদিন যে শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, আজ কি আমরা তা পারবো না? না পারলে বুঝতে হবে আমাদের রাজনীতি দেউলিয়া॥

মস্কো যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়

॥ ১ ॥

লজ্জায় জর্মন জাঁদরেলরা হিটলারকে মুখ দেখাতে পারতেন না। রুশ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বারবার সপ্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে, জাঁদরেলরা ভুল করছেন—সত্যপন্থা জানেন হিটলার।

ভের্সাইয়ের চুক্তিতে পরিষ্কার শর্ত ছিল জর্মনি রাইনলাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। হিটলার যখন করতে চাইলেন তখন জেনারেলরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে বললেন, 'যদি তখন ফ্রান্স আমাদের আক্রমণ করে তবে....?' হিটলার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'করবে না।' হিটলারের কথাই ফলল। অবশ্য হিটলার পরে একাধিকবার স্বীকার করেছেন, তখন ফ্রান্স আক্রমণ করলে জর্মনি নির্ঘাত হেরে যেত। তার পর হিটলার পর পর অস্ট্রিয়া ও চেকো-স্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন—জেনারেলদের আপত্তি সত্ত্বেও—ফরাসী ইংরেজ রা-টি পর্যন্ত কাড়লে না। বারবার তিনবার লজ্জা পাওয়ার পরও পোলাণ্ড আক্রমণের পূর্বে জেনারেলরা ফের গড়িমসি করেছিলেন, এমন কি ফ্রান্স আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁরা ঐ 'জুয়ো খেলতে' চাননি। কিন্তু বারবার হিটলার প্রমাণ করলেন, জেনারেলদের আর যা থাক থাক, সমরনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই—ভবিষ্যদ্বাণী করা তো দূরের কথা।

এতবার লজ্জা পাওয়ার পর তাঁরা আর কোন্ মুখ নিয়ে আপত্তি করতেন—হিটলার যখন রুশ আক্রমণ করবার প্রস্তাব তাঁদের সামনে পাড়লেন? এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করার পর যে হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সে কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন। বক্ষ্যমাণ 'টেস্টামেন্টেই' আছে,

'এ যুদ্ধে আমাকে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে তার মধ্যে কঠিনতম সিদ্ধান্ত রুশ আক্রমণ। আমি বরাবর বলে এসেছি, সর্বত্র পণ করেও যেন আমরা দুই ফ্রণ্টে লড়াই করাটা ঠেকিয়ে রাখি, এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আমি নেপোলিয়ন এবং তাঁর রুশ-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপন মনে বহুদিন ধরে বিস্তর তোলপাড় করেছি।'

এ-সব তত্ত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও জেনারেলরা তো মানুষই বটেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের আকছারই যে আচরণ হয় তাঁদেরও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ জর্মনি যখন পোলাণ্ড, গ্রীস, ফ্রান্স একটার পর একটা লড়াই জিতে চললো তখন জাঁদরেলরা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে বললেন, 'আমরা জিতেছি, আমরা লড়াই জিতেছি।' হিটলারকে স্মরণে আনবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন না।[১] কিন্তু হিটলার রুশযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলে পর এই জাঁদরেলরাই মোটা মোটা কেতাব লিখলেন, 'হিটলার অগা, হিটলার বুদ্ধু—তারই দুর্বুদ্ধিতেই আমরা লড়াই হারলুম।' বাঙলা প্রবাদে বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন'। ফ্রান্স-জয়ের দই খেলেন জাঁদরেলরা, রুশ-

১ একমাত্র জঙ্গীলাট কাইটেল করেছিলেন। ফ্রান্স পরাজয়ের খবর পৌঁছলে তিনি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার হয়ে হিটলারকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, 'আপনি সর্বকালের সর্ব সেনাপতির প্রধানতম।' Groesste Feldherr aller Zeiten। ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বলি, হিটলার যখন রুশে পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন তখন জর্মন কাষ্ঠরসিকরা Groesste-এর Gr, Feldherr-এর F, aller-এর A এবং Zeiten-এর Z নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে Grofatz নির্মাণ করেন। এখানে Gro মানে বিরাট এবং fatz শব্দের অর্থ—গ্রাম্য ভাষায় বাতকর্ম। আমি বাঙলায় ভদ্রশব্দটি প্রয়োগ করলুম। বাঙলা আটপৌরে শব্দটির সঙ্গে জর্মন শব্দটির উচ্চারণের মিল এস্থলে লক্ষ্যণীয়।

পরাজয়ের বিকার হল হিটলারের। অবশ্য তাঁর পক্ষে এই সান্ত্বনা যে, তিনি এসব বই দেখে যান নি।

অবশ্য তিনিও কম না। জাঁদরেলরা যা করেছেন, তিনিও তাই করে গেছেন। পোলাণ্ড ফ্রান্স জয়ের গর্ব তিনি করেছেন পুরো ১০০ নঃ পঃ, কিন্তু রুশ-অভিযান-নিষ্ফলতার জন্য দায়ী করেছেন তাঁর জাঁদরেলদের ন' সিকে। তিনি আত্মহত্যা করবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যে উইল লিখে যান তাতে তিনি লিখেছেন, 'বিমানবাহিনী লড়েছে ভালো, নৌবহরও কিছু কম নয়, স্থল-সৈনিকরাও লড়েছে উত্তম, কিন্তু সর্বনাশ করেছে ঐ জাঁদরেলরা।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তারা মূর্খ, তারা প্রগতিশীল নয়, যুদ্ধের সময় তাদের চিন্তা তাদের কর্মধারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৪১-৪৫ সালে তারা যে কায়দায় লড়ছে সেটা যেন ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধ! ব্লিৎস ক্রীগ—বিদ্যুৎ-গতি-যুদ্ধ—এ যে কি জিনিস তারা আদপেই বুঝতে না পেরে পদে পদে আমার আদেশ অমান্য করেছে।'[২]

অর্থাৎ এবার দই খাচ্ছেন হিটলার, বিকারের বেলা জাঁদরেলরা। ফ্রান্স, পোলাণ্ড জয় করেছিলেন তিনি, রুশ-যুদ্ধে হারলো জর্মন জাঁদরেলেরা!

কিন্তু এহ বাহ্য। রুশ-যুদ্ধে জর্মনির হার হয়েছিল অন্য কারণে।

বহু রণপণ্ডিত এ-কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সে পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী শ্রীমান মুস্‌সোলীনী! হিটলার বলছেন (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫),

"ইটালি যুদ্ধে প্রবেশ করামাত্র আমাদের শত্রুদের এই প্রথম কয়েকটি সংগ্রাম জয় সম্ভব হল (এস্থলে হিটলার ইংরেজ কর্তৃক

২ যেমন মনে করুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কানুন ছিল, শত্রু পরাজিত হলেও এক দিনের ভিতর কুড়ি মাইলের বেশী এগোবে না, পাছে তোমার লাইন অব কম্যুনিকেশন ছিন্ন হয়ে যায়। ব্লিৎসক্রীগে পঞ্চাশ মাইলও নস্যি।

উত্তর আফ্রিকা জয়ের কথা বলছেন) এবং তারই ফলে চার্চিলের পক্ষে সম্ভব হল তার দেশবাসী তথা পৃথিবীর ইংরেজ-প্রেমীদের মনে সাহস এবং ভরসা সঞ্চার করা। ওদিকে মুস্সোলীনী আবিসিনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় হেরে যাওয়ার পরও গোঁয়ারের মত হঠাৎ খামোখা আক্রমণ করে বসল গ্রীসকে—আমাদের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ না চেয়ে, এমন কি আমাদের সে-সম্বন্ধে কোনো খবর না দিয়ে।[৩] খেল বেধড়ক মার ; ফলে বল্কানের রাজ্যগুলো আমাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলো। বাধ্য হয়ে, আমাদের তাবৎ প্ল্যান ভণ্ডুল করে নামতে হল বল্কানে (এবং গ্রীসে) এবং তাতে করে আমাদের রুশ অভিযানের তারিখ মারাত্মক রকম পিছিয়ে (কাটাস্ট্রফিক ডিলে) দিতে হল। এবং তারই ফলে আবার বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কতকগুলো অত্যুত্তম ডিভিশন পাঠাতে হল সেখানে। এবং সর্বশেষ নেট্ ফল হল, বাধ্য হয়ে আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যকে খোদার-খামোখা বল্কানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন করে রাখতে হল। (হিটলার বলতে চান, তা না হলে এ সৈন্যদের রুশ অভিযানে পাঠানো যেত। পক্ষান্তরে তখন তাদের সরালে ইংরেজ ফের গ্রীসে আপন সৈন্য নামাতো, এবং মুস্সোলীনী একা যে তাদের ঠেকাতে পারতেন না, সে তো জানা কথা)।

হায়, ইটালি যদি এ যুদ্ধে না নামত! তারা কোনো পক্ষে যদি যোগ না দিত!

এ যুদ্ধ একা যদি জর্মনিই লড়ত—এ যদি অ্যাকসিসের যুদ্ধ না হত—তবে আমি ১৫ই মে, ১৯৪১-এ-ই রাশা আক্রমণ করতে পারতুম। জর্মন সৈন্য ইতিপূর্বে কোথাও পরাজিত হয়নি বলে

৩ মুস্সোলীনী বলেছেন, 'হিটলার প্রতিটি লড়াই লড়েছে আমাকে নোটিশ না দিয়ে—আমিই বা কেন আগে ভাগে দিতে যাব ?'

আমরা শীত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই (১৯৪১-৪২-এর শীত) যুদ্ধ খতম করে দিতে পারতুম।" (ইটালির গ্রীস আক্রমণের ফলে ও তাকে সাহায্য করতে গিয়ে সময় নষ্ট হওয়াতে, হিটলার রাশা আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন প্রায় এক মাস পরে। ফলে তিনি যখন মস্কোর কাছে এসে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ প্রচণ্ড শীত আর বরফপাত আরম্ভ হল—এ রকম ধারা শীত আর বরফ রাশাতেও বহুকাল ধরে পড়েনি—যুদ্ধের তাবৎ যন্ত্রপাতির তেল চর্বি জমে গেল, শীতের পূর্বেই জর্মন সৈন্য মস্কো দখল করে সেখানে শীতবস্ত্র লুট করতে পারবে বলে তারও কোনো ব্যবস্থা হিটলার করেন নি, বহু হাজার সৈন্য শুধু শীতের অত্যাচারেই জমে গিয়ে মারা গেল। বলা যেতে পারে এই শীতেই হিটলারের পরাজয় আরম্ভ হল—যদিও সেটা দৃশ্যমান হল তারপরের শীতে স্টালিনগ্রাডে।)

হিটলার হা-হুতাশ করে বলেছেন, 'হায়, তাই সব-কিছু সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল!'

কিন্তু প্রশ্ন, মস্কো দখল করতে পারলেই কি হিটলার শেষ পর্যন্ত জয়ী হতেন?

নেপোলিয়ন তো মস্কো জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ জয় করতে পারেন নি।

॥ ২ ॥

গত প্রবন্ধে মস্কো যুদ্ধের বর্ণনা লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে খাস মস্কো থেকে একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে। মস্কো যুদ্ধের বিংশ বাৎসরিক স্মরণ দিবসে গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৬১ খৃ) মস্কো শহরে মার্শাল রকসফ্‌স্কি তাস্‌ এজেন্সিকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জর্মনরা স্থির করেছিল, মস্কোকে জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের মত করে ফেলবে। পরে যখন দেখা গেল টেকনিকাল কারণে সেটা সম্ভবপর নয় তখন তারা বোমা ফেলে সেটা ধ্বংস করার চেষ্টা দিল।

আমার মনে হয়, টেকনিকাল কারণে সম্ভবপর হলেও কৃত্রিম বন্যায় মস্কো ভাসিয়ে দেবার প্রস্তাবে হিটলার স্বয়ং রাজী হতেন না। তাঁর প্ল্যান ছিল, জর্মন সৈন্য মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় এবং কিছু কিছু খোরাক পাবে—কিন্তু প্রধানত গরম জামা-কাপড় ও শীতের আশ্রয়ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য, কারণ যুদ্ধ শীতের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সে-ব্যবস্থা করেননি। (এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, জর্মনিতে কোনো কালেই উলের প্রাচুর্য ছিল না—জর্মনি চিরকালই তার জন্য নির্ভর করেছে প্রধানত স্কটল্যাণ্ডের উপর এবং মস্কোর দোরে যখন জর্মনরা আটকা পড়ে গেল তখন হিটলারকে বাধ্য হয়ে জর্মনির জনসাধারণের কাছে শীতবস্ত্রের জন্য ঢালাও আবেদন জানাতে হল)। কাজেই মস্কো শহরকে সমুদ্রে পরিণত করলে তাঁর কোনো লাভই হত না। এবং মনে পড়ছে, নেপোলিয়নের বেলাতে রুশরা নিজেই কাঠের তৈরী মস্কো শহর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার ফলে তিনি মস্কোর শ্মশানভূমিতে তাঁর সৈন্যের জন্য এক কণা ক্ষুদ, ঘোড়ার জন্য এক রত্তি দানা

পাননি। এবারে রুশরা সেটা চাইলেও করতে পারতো না, কারণ ইতিমধ্যে তাবৎ মস্কো শহর কনক্রিট আর লোহাতে তার বাড়িঘর বানিয়ে বসে আছে। সেটাকে পোড়ানো অসম্ভব।

কাজেই মস্কো জয় করে নেপোলিয়ন লাভবান হননি, কিন্তু হিটলার হতেন।

মার্শাল রকসফ্স্কি আরো বলেছেন, মস্কোবাসী এবং সেখানকার রুশ সৈন্যদল জর্মনদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তারা সেটা গ্রহণ করেনি। এটা সত্যই অত্যন্ত চমকপ্রদ খবর। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, কোনো নগর আত্মসমর্পণ করলে সেটাকে বে-এক্তেয়ার লুট-তরাজ করা যায় না।[১]

অবশ্য যে সব ভুলের ফলে হিটলার মস্কো দখল করতে পারলেন না, সেগুলো না করে মস্কো দখল করতে পারলে তিনি যে তারপর অন্য ভুল করে যুদ্ধ হারতেন না, সে কথা বুক ঠুকে বলবে কে?

* * *

সমস্ত জর্মনি যখন রুশ, ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে, রুশবাহিনী প্রায় তাবৎ বার্লিন দখল করে হিটলারের বুংকারের থেকে দু' পাঁচ শ' গজ দূরে, বুংকার সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, বার্লিনের বাইরে তাঁর সৈন্যদল ও সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে ব্যস্ত তখনো হিটলার কিসের আশায় পরাজয় স্বীকার করছিলেন না? আত্মহত্যার ঠিক তিন মাস পূর্বে হিটলার তাঁর আদর্শ মানব ফ্রেড্রিককে স্মরণ করে বলছেন,

১ এর সঙ্গে তুলনীয় মার্কিন কর্তৃক হিরোশিমায় অ্যাটম বম প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির পরাজয়ের পর জাপান নিরপেক্ষ সুইডেনের মারফতে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। মার্কিন সেটা গ্রহণ করলে হিরোশিমায় অ্যাটম বম ফাটিয়ে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই করেনি। করলো এক্সপেরিমেণ্টটা দেখে নিয়ে।

'না। একেবারে আর কোনো আশা নেই, এরকম পরিস্থিতি কখনো আসে না। জর্মনির ইতিহাসে আকস্মিক কতবার তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে সেইটে শুধু একবার স্মরণ করো। সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে ফ্রেডরিক তাঁর নৈরাশ্য এবং দুরবস্থার এমনই চরমে পৌঁছেছিলেন যে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি মনস্থির করেন যে, বিশেষ একটি দিনের ভিতর তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত না হলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। ঐ স্থির করা বিশেষ দিনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে জারিনা হঠাৎ মারা গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন দৈবযোগে সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মহান পুরুষ ফ্রেডরিকের মত আমরাও কয়েকটি সমবেত শক্তির (কোয়ালিশনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, এবং মনে রেখো, কোনো কোয়ালিশনই চিরন্তনী সত্তা ধরে না। এর অস্তিত্ব শুধু গুটি কয়েক লোকের ইচ্ছার উপর। আজ যদি হঠাৎ চার্চিল অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তড়িৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ব্রিটেনের খানদানী মুরুব্বিরা সেই মুহূর্তেই দেখতে পাবে তারা কোনো অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে—এবং চৈতন্যোদয় হবে তখন।'

হিটলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন মার্কিন এবং ইংরেজ একদিন না একদিন অতি অবশ্য বুঝতে পারবে, ওদের শত্রু জর্মনি নয়, ওদের আসল শত্রু রুশ। এবং সেইটে হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই তারা জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে, সবাই এক জোট হয়ে লড়াই দেবে রুশের বিরুদ্ধে। হিটলার আশা করেছিলেন, যেদিন মার্কিনিংরেজ জর্মনির কিয়দংশ দখল করার পর রুশের মুখোমুখি হবে সেইদিনই লেগে যাবে ঝগড়া, মার্কিনিংরেজ স্পষ্ট বুঝতে পারবে, রুশ কী চীজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু ঠিক সেইটেই হল না। বার্লিনকে বাইপাস করে রুশ এবং মার্কিনিংরেজ যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সুবোধ বালকের ন্যায় আপন আপন

গোঠে জমিয়ে বসে গেল।

এবং অদৃষ্ট হিটলারের দিকে শেষ মুহূর্তে কী নিদারুণ মুখ-ভেংচিই না কেটে গেলেন।

হিটলারের দুর্দশা যখন চরমে, তিনি যখন দিবারাত্রি আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন, গ্যোবেল্‌স্ প্রভুর হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের জন্য কার্লাইলের লিখিত 'ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ইতিহাস' মাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়ে যান, এমন সময় উত্তেজনায় বিবশ গ্যোবেল্‌স্ প্রভুকে ফোন করলেন, 'মাইন ফ্যুরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিয়তি আপনার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছেন। জারিনা মারা গেছেন।'

এস্থলে জারিনা অবশ্য রোজোভেল্ট: তিনি মারা যান ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫।

কিন্তু হায়, চার্চিল নয়, অদৃশ্য হলেন রোজোভেল্ট। তবু মন্দের ভালো। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ হায়, হায়—রোজোভেল্টের মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন তার সমরনীতি বদলালো না। হিটলার প্রতিটি মুহূর্ত গুনলেন অধীর প্রত্যাশায়—ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আত্মহত্যা করলেন তার আঠারো দিন পরে। ফ্রেডরিককে করতে হয় নি।

* * *

এইবারে তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণী:

'জর্মনি হেরে গেলে, যতদিন না এশিয়া, আফ্রিকা এবং সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার ন্যাশনালিজমগুলো জাগ্রত হয়, ততদিন পৃথিবীতে থাকবে মাত্র দুটি শক্তি যারা একে অন্যকে মোকাবেলা করতে পারে —মার্কিন এবং রুশ। ভূগোল এবং ইতিহাসের আইন এদের বাধ্য করবে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা অর্থনীতি এবং আদর্শবাদের (ইডিয়লজিকাল) সংগ্রাম। এবং সেই ইতিহাস ভূগোলের আইনেই উভয় পক্ষই হবে ইয়োরোপের শত্রু। এবং এ

বিষয়েও কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক, উভয় পক্ষকেই ইয়োরোপের একমাত্র বিদ্যমান শক্তিশালী জর্মন জাতির বন্ধুত্বের জন্য হাত পাততে হবে।'

এর টীকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় যে জর্মনিতেই হচ্ছে সে-কথা কে না জানে? আর আডেনাওয়ারের কণ্ঠস্বর যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে সেও তো শুনতে পারছি! এবং রুশ যে পূর্বজর্মনির মারফতে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে আলাদা, সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব, সেও তো জানা কথা॥

কুট্টি

পূব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাদের সংখ্যা একলপতে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পূব-বাঙলার উপভা[illegible] শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকা[illegible] বাঙাল ভাষার (আমি কোনো কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার কর[illegible] শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আ[illegible] পুরো ফায়দা এখনো কোনো লেখক ওঠান নি। পূব-বা[illegible] লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে স[illegible] করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। [illegible]ষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা 'ইডিয়মে'—অ[illegible] ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে ইডিয়ম প[illegible] তথা পূব-বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন [illegible] করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরীব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতীর লগে সঙ্গ পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে?' অর্থাৎ 'হাতীর সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সে কথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক গুৎরাবে না। আবার—

দুষ্টু লোকের মিষ্ট কথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিনই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পূব, পশ্চিম কোনো বাঙলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ গুণটি ঢাকা শহরের 'কুটি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পূব-বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখীন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক কিন্তু এদের সবাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলবো, কুট্টির সঙ্গে ফস্‌ করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম। খুলে কই।

প্রথম তাহলে একটি সর্বজন পরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরিজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুল রুম টু দি ওয়ার্লড ওয়াইড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিম বাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী ঃ রমনা যেতে কত নেবে?

কুট্টি গাড়োয়ান : এমনিতে দেড় টাকা ; কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।

যাত্রী : বলো কি হে ? ছ আনায় হবে না ?

গাড়োয়ান : আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।

এর যুৎসই উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে এ জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে এক সঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর। কিন্তু কুট্টিরা হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরী করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন একটি কুট্টি গিয়ে যে ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কি ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে ? সক্কলের শেষে এল ?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন কি কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা ; বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিম্বা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলতি অপটিমিজ্‌ম্‌।'

কিম্বা আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্ণিং স্যুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হ্যাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়-কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আশপাশ দেখলেন, কোনো

কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। যে-কুট্টি কোচম্যান সঙ্গে ছিল সে শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের ওপর ছ'টা বোতাম, আর দু হাতে কব্জীর কাছে তিনটে তিনটে করে ছ'টা বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখর-খানী (বাকিরখানী) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলী এভিন্যুতেই অন্ততঃ আধা ডজন দোকানের সাইন বোর্ডে 'বাখরখানী' লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিলিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে রকম পশ্চিম বাঙলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম একদা কলকাতার নিতান্ত ককনিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিম্বা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার করা, যে ভাষা অন্যপক্ষ বা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পূব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ্' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেলেল্লা-বেহেড, দোগেড়ের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য বক্তা যদি সুরসিক হন এবং

আসরে মাত্র একটি কিম্বা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের ভদ্র আড্ডাতে পূব-বাঙালীর সংখ্যা থাকতো অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্যভঙ্গী বানাতেন যে রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পূব-বাঙলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দবিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এরা বাড়ীতে এসব শব্দ এখনো ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ীর লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পূব-বাঙলার সদস্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলি ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাঙলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাঙলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ ছিল ভাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাঙলা এবং সে বাঙলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে বাঙলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেণে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে বাঙলা বলতেন তার ওপর বাঙলা সাহিত্যের বা পূব-বাঙলার কথ্য ভাষার কোন ছাপ

কখনো পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরাণ, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ অধম এন্তার বাঙলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালী চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের একদিক দিয়ে গরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জল-তরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারী বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ টারালাপ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিকুটি হয় নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবু এখনো আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমারও স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করলো।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিতও হয়েছিল। আমার কোনো পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছে কিনা, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণী)

একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়-সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি' বাড়ির ব্যারাকে থাকতো। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তী কালে ইংরেজ বাহিনীতে এদের স্থান হয় নি বলে, কিংবা মোগলের নেমকহারামী করতে চায় নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারী করতে তারা জানতো। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভলরি অঙ্গে কাজ করতো। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলতো, পরে ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষার' সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনো 'লেকিন্, মগর' এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পূব-বাঙলার মৌলবী সায়েবরাও 'লেকিন, মগর,' ছাড়া আরও বহু বহু আরবী ফার্সী শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন—ঐ অঞ্চলের হিন্দু পণ্ডিতরাও যে রকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভী দেশ হয়, ফির কণ্ঠদেশ কৌন্ দেশ হ্যায় ?'

বছর পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ঐ আমলের কুট্টি-ভাষার উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় :

'করিম বস্‌কৃকা মা নে আর রহিম বস্‌কৃকা জরুনে এয়সা লাগিস্ লাগিস্তা কে এ ভি উসকা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগলো (কোঁদল) যে এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোন ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার উপর বিরক্ত না হন—কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য

অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উর্দু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা আন্দোলনে বাঙলা ভাষার পক্ষ নেন।)

* * *

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পূব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন (ধর্ম)॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয়। (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়॥

এ ছত্রগুলি ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধূ ধা করে চলেছে (নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করাতে (মর্মে মর্মে তাঁকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই; তবে শেষের দু'ছত্র আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা,' ধরি'।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধূ ধূ ধা ধা করি'॥'

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মশায়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি' অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলা বাহুল্য পূব-বাঙলার ভাটিয়ালি গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম বাঙলার

বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নূতন নূতন জিনিস আমদানি হলে তাকে সিম্‌বল, রূপক রূপে, এলেগরি করে মরমিয়া (মিষ্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলি বাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ 'মোতীফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

*　　　　*　　　　*

প্রধানতঃ রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত এরা নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে—অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়। আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭।৪৮'সালে নির্মিত।

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলিম লীগ কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাক্‌টিরিসটিক্—অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্‌টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'—অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।

মুসলিম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপোগাণ্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি—লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র

আমাদের মায়ের মত! মাকে যদি খাওয়াও পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনাটা ট্যাক্সোটা ঠিকমত দাও; মায়ের দুধ তুমিই পাবে।' তখন এক:ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠলো, 'কইছো ঠিকই, লেকিন বাবা হালারা যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিষ্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।...মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ কারো প্রতিই আমাদের কোনো বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

* * *

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরিয়ে আনতো। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে গেলেও। এবং শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারীতে কখনো গাফিলি করেছে বলে শোনা যায় নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ঐ শিভাল্‌রাস কথাটি এসেছে ফরাসী 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানী ফরাসীদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগলবাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

দরখাস্ত

এইমাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কেটে পড়ো।

চোদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থ চোদ্দ বছর। তারপর মুক্তি। ঠিক সেইরকম আমার এক ফরাসী-বন্ধু তাঁর সিলভার ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে জেলে মেক্সিমাম ক'বছর পুরে রাখে? আমি ঐ উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে পঁচিশটি বৎসর বন্দী হয়ে কাটালুম। এখনো কি মুক্তি পাবো না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন. 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই সে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধলো, "ডালিং! তবে কি আমাদের হানি-মুন শেষ হয়ে গেল?" ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আক্কেল হয়ে গেল। এরপর আর ককৃখনো রা-টি পর্যন্ত কাড়ি নি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়ই শুয়ে পড়ে তারই যমজ সন্তান হয়"।' ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে-সক্কলকে একটা রাউণ্ড খাইয়ে দিলে।

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি—তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক—জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলী পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চোদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চান না। উত্তম শায়েস্তা-প্রাপ্ত কয়েদীকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়—অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

আমি কিন্তু মহারাণীর কাছে আপীল করেছি—'চোদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪। আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমৎলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তর চিন্তাজগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম্ কে জেরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট করবে'। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ঈভন্ এ কাউ!'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমৎলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থলাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন—তাই তাঁকে একাধিক-

বার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই—'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা তার চেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখোনই আসে নি। কাজেই মূল্য বোঝা-না-বোঝার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। আমি চিরটা কাল 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'; কাজেই বছরটা আঠেরো মাসে যাচ্ছিল।

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেলেন। বেহশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনো অপকর্ম (গুনাহ্‌) তিনি করেন নি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের ঈভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডে বেরিয়েছে, ফ্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌-এশেমেডলি আই এডমিট—আই রাইট ফর্‌ মানি।'

এরপর যে-সব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, স্কট্‌, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ কাউলি। তিনি তারপর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানেই থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌-ওলের লেখা যাঁরা স্মরণে রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ডঃ জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না; 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার চেয়েও বড় গাড়োল, যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারলো না।

আমি ডঃ জনসনের পদধূলি হওয়ার মতও স্পর্ধা ধরি নে; অতএব তাঁর মত কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন্‌ উদ্দেশ্য

নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঁঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলবো আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্। আর দেখ্, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন ; তাই, তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারী চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলে যাচ্ছিল তাই বাগেদবীকে বানরীর মত ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচাতে হল না (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং না ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগেদবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥)।

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কি বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র ; শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন ; সেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পনিস্ট রস্‌সীনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনো এ্যলেম্ আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করবো কোন্ দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন। তারপর তিনি

বোধহয় আরো ছুটি অপ্‌রা তৈরি করেন—এক বার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেক বার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

রস্‌সীনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পয়সা কামাবার মত বিদ্যে আমার ব্রেন্‌-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (পীপিংটম্‌—নোজীপার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি ?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্‌ ফ্রম্‌ টাইম্‌ টু টাইম্‌)।'

ফরাসী শুধোলে, 'তাহলে চলে কি করে ?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশন্‌গুলো দেখছো ; আমি জব্‌গুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি, মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা। স্বেচ্ছায় না লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক্ লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যে রকম কোল্ড ব্লাডেড্ খুন হয—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি, না?—শব্নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি, না, 'চাচাটি' কে, আমি আমার বউকে ডরাই কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মত খাটাশ্-টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কি করা যায়। এবং এসে রীতিমত হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা-পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মত লোম, মাথা-জোড়া টাক—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয় নি বলে মুখটি কদম-ফুল,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি রীতিমত নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর মে-মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফত সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কখনো লিখব না, একথা বলছি নে। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে॥

সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার

হুইট্‌নি বললে, 'ডান দিকে—ঠিক কোথায় জানিনে—বেশ বড় একটা দ্বীপ রয়েছে। সে একটা রহস্য—'

রেন্‌স্‌ফর্ড শুধালে, 'নাম কি দ্বীপটার?'

'পুরানো দিনের ম্যাপে নাম রয়েছে "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ।" নামটার থেকেই অর্থ কিছুটা আমেজ করা যায়, নয় কি? মাঝি মাল্লারদের ভিতর দ্বীপটার প্রতি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয়। কি জানি কেন। কিছু একটা কুসংস্কার বোধ হয়—'

ইয়ট জাতের ছোট্ট জাহাজখানির চতুর্দিকে গরমদেশের গাঢ়, ভেজা ভেজা অন্ধকার যেন চেপে ধরেছে। তারই ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'ওটাকে দেখতে পাচ্ছিনে তো।'

উইট্‌নি হেসে বললে, 'তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর সে আমি জানি। চারশ গজ দূর থেকে মূস-মোষের মত শিকারকে ঝোপের ভিতর দেখে ফেলতে আমি তোমাকে দেখেছি কিন্তু ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের অন্ধকার রাত্রে চার পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা তোমারও কর্ম নয়।'

রেন্‌স্‌ফর্ড সম্মতি জানিয়ে বললে, 'চার গজও না। আখ্—অন্ধকারটা যেন কালো মখমল।'

উইট্‌নি যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, 'রিয়ো পৌঁছলে বিস্তর আলোর মেলা পাবে, ভয় কি! কয়েক দিনের ভিতরেই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি। জাগুয়ার শিকারের বন্দুকগুলো পর্দোর কাছ থেকে পৌঁছে গেলেই হয়। আমাজন অঞ্চলে উত্তম শিকার পাবো বলে আশা করছি। শিকারের মত আর কোনোই খেলই হয় না।'

'পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা খেল।' সম্মতি জানালে রেন্‌স্‌ফর্ড।

কিঞ্চিৎ সংশোধন করে উইট্নি বললে, 'শিকারীর পক্ষে—জাগুয়ারের পক্ষে নয়।'

'আবোল-তাবোল বকো না, উইট্নি। তুমি বড় বড় জানোয়ারের শিকারী—তুমি দার্শনিক নও। জাগুয়ার কি অনুভব করে, না করে তাতে কার কি যায় আসে?'

'হয়তো জাগুয়ারের যায় আসে।'

'ছোঃ! তারা আবার ভাবতে পারে না কি?'

'তা সে যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয়, তারা অন্তত একটা জিনিস বোঝে—ভয়। যন্ত্রণার ভয় আর মৃত্যুভয়।

'গাঁজা!'—হেসে উঠলো রেন্স্ফর্ড। 'গরমে তোমার মগজ গলে যাচ্ছে—বুঝলে উইট্নি? বাস্তববাদী হতে শেখো। পৃথিবীতে দুটি শ্রেণী আছে। শিকারী আর শিকার। কপাল ভালো যে তুমি আমি শিকারী। আচ্ছা, আমরা কি ঐ দ্বীপটা পেরিয়ে এসেছি?'

'অন্ধকারে বলতে পারবো না। আশা তো করছি তা-ই।'

'কেন?'

'জায়গাটার নাম আছে—বদনাম।'

'নরখাদক আছে ওখানে?'

'তার সম্ভাবনা অল্পই। এমন লক্ষ্মীছাড়া জায়গাতে ওরাও থাকতে যাবে না। কিন্তু বদনামটা খালাসী মাঝিদের মধ্যে যে করেই হোক রটে গেছে। লক্ষ্য করো নি আজ ওরা কি রকম যেন এক অজানা আতঙ্কে সন্ত্রস্ত ছিল?'

'তোমার বলাতে এখন মনে হচ্ছে কেমন যেন তাদের ধরনধারণ আজ অন্য রকমের ছিল। কাপ্তান নীলসেন পর্যন্ত—'

'হ্যাঁ এমন কি ঐ যে তাগড়া কলিজার বুড়ো সুইড্ নীলসেন—খুদ শয়তানের কাছে গিয়ে যে নির্ভয়ে দেশলাইটি চাইতে পারে, মাছের

মত অসাড় তার নীল চোখেও আজ এমন ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম যেটা পূর্বে কখনো দেখি নি। যেটুকু বললে তার মোদ্দা, "খালাসী-লস্করদের ভিতর এ জায়গাটার ভারী দুর্নাম।" তার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমাকে শুধোলে, "কেন, আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না?" যেন আমাদের চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস বিষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। দেখো, ঐ নিয়ে কিন্তু হেসে উঠো না, যদি বলি আমারও সর্বাঙ্গ যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল। ঐ সময়ে কোনো বাতাস বইছিল না। ফলে সমুদ্র জানলার শার্সির মত পালিশ দেখাচ্ছিল। আমরা তখন ঐ দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল আমার বুকটা যেন শীতে জমে হিম হয়ে যাচ্ছিল —হঠাৎ যেন এক অজানা ত্রাস।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'নির্ভেজাল আকাশ-কুসুম! একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিক সমস্ত জাহাজের নাবিকদের মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে।'

'তাই হয়তো হবে। কিন্তু জানো, আমার মনে হয়, নাবিকদের যেন একটা আলাদা ইন্দ্রিয় আছে যেটা বিপদ ঘনিয়ে এলে তাদের জানিয়ে দেয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অমঙ্গল যেন একটা বাস্তব পদার্থ—ধ্বনি বা আলোর থেকে যে রকম তরঙ্গ বেরোয়, অমঙ্গলের শরীর থেকেও ঠিক তেমনি। সে ভাষায় বলতে গেলে বলবো, অমঙ্গলের পাপভূমি যেন বেতারে অমঙ্গল ছড়ায়। তা সে যা-ই হোক, এ এলাকাটা ছাড়িয়ে যেতে পারছি বলে আমি খুশী। যাক্‌গে, আমি এখন শুতে চললুম, রেন্‌স্‌ফর্ড।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার এখনো ঘুম পায় নি। পিছনের ডেকে বসে আমি আরেকটা পাইপ টেনে নিই।'

'তা হলে গুড নাইট্‌, রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল ব্রেকফাস্টে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে! গুড নাইট্‌, উইট্‌নি।'

রাত্রি নিস্তব্ধ নীরব। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যে এঞ্জিন ইয়টটিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল শুধু তারই চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিল আর তার সঙ্গে প্রপেলারের মার খেয়ে জলের শব্দ।

ডেক্-চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসরভসে রেন্‌স্‌ফর্ড তার শখের ব্রায়ার পাইপে টান দিচ্ছিল। রাত্রি যেন ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব তার শরীরে আবেশ লাগাচ্ছিল। আপন মনে চিন্তা করলে, 'রাতটা এমনই অন্ধকার যে মনে হয় চোখের পাতা বন্ধ না করেই ঘুমুতে পারবো ; রাতটিই হবে আমার চোখের পাতা—'

হঠাৎ একটা আওয়াজ এসে তাকে চমকে দিল। ডান দিক থেকে শব্দটা এসেছিল। এসব ব্যাপারে সে সজাগ, সব কিছু ঠিক ঠিক জানে। তার কান ভুল করতে পারে না। আবার সে সেই শব্দটা শুনতে পেল, তার পর আবার। ঐ দূরের অন্ধকারে কে যেন তিন বার গুলি ছুঁড়েছে।

কি রহস্য বুঝতে না পেরে রেন্‌স্‌ফর্ড লাফ দিয়ে উঠে ঝটিতি রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেই দিকে যেন চোখ ঠেলে দিলে ; কিন্তু এ যেন কম্বলের ভিতর দিয়ে দেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আরেকটু উঁচু থেকে দেখবার জন্য সে রেলিঙের একটা রডে লাফ দিয়ে উঠে তার উপর দাঁড়ালো। তারই ফলে একটা দড়িতে লেগে তার পাইপটা মুখ থেকে ঠিকরে পড়ে যেতেই সেটাকে ধরবার জন্য সে ঝটিতি সামনের দিকে ঝুঁকতেই তার গলা থেকে কর্কশ আর্তনাদ বেরুলো—কারণ সে তখন বুঝে গিয়েছে যে বড্ড বেশী এগিয়ে যাওয়ার ফলে সে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। তার সে আর্তনাদ টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিলে ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের কুসুম কুসুম গরম জল। তার মাথা পর্যন্ত তখন সে-জলে ডুবে গিয়েছে।

যেন ধস্তাধস্তি করে সে জলের উপরে উঠে চিৎকার দেবার চেষ্টা

করলো, কিন্তু ইয়টের দ্রুতগতির মারে ছুটে আসা জল যেন কষালে তার গালে চড় আর নোনা জল তার খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে যেন তার টুঁটি চেপে ধরে দম বন্ধ করে দিল। দু বাহু বাড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মরীয়া হয়ে ক্রমশ অদৃশ্যমান ইয়টের দিকে সাঁতার কাটতে লাগলো, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট চলার পূর্বেই সে আর সে-চেষ্টা দিল না। ততক্ষণে তার মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ; জীবনে এই তার সর্বপ্রথম কঠিন সঙ্কট নয়। জাহাজের কেউ তার চিৎকার শুনতে পাবে সে সম্ভাবনা অবশ্য একটুখানি ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং ইয়ট যতই দ্রুতগতিতে এগুতে লাগলো সে-সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হতে লাগলো। যেন পালোয়ানের মত শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে তার জামাকাপড় থেকে মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু ইয়টের আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো যেন দূরের ক্রমশ অদৃশ্যমান জোনাকি পোকা। সর্বশেষে ইয়টের আলোগুলোকে অন্ধকার যেন শুষে নিল।

ইয়টের ডেকে বসে রেন্‌স্‌ফর্ড যে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সেগুলো তার স্মরণে এল। সেগুলো এসেছিল ডান দিক থেকে। চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগলো—ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে সে ভেবেচিন্তে হাত দুখানা ব্যবহার করছিল। ক'বার সে হাত ছুঁড়ছে সেটা সে গুনতে আরম্ভ করলো ; সম্ভবত সে আরো শ খানেক বার হাত ফেলতে টানতে পারবে, এমন সময়—

রেন্‌স্‌ফর্ড একটা শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উচ্চকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকারের শব্দ। কঠোরতম যন্ত্রণা ও ভীতির চিৎকার।

কোন্ প্রাণী এ আর্তরব ছাড়লো সে সেটাকে চিনতে পারলো না—চেষ্টাও করলো না। নবোদ্যমে সে সেই চিৎকারের দিকে সাঁতার

কেটে এগুতে লাগলো। সেটা সে আবার শুনতে পেল ; এবারে সেটা অন্য একটা ছোট্ট, হঠাৎ বেজে-ওঠা শব্দে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সাঁতার কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'পিস্তলের শব্দ।'

আরো দশ মিনিট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাঁতার কাটার পর রেন্‌স্‌ফর্ডের কানে আরেকটা ধ্বনি এল—জীবনে সে এরকম মধুর ধ্বনি আর কখনো শোনে নি—পাহাড়ি বেলাভূমির উপর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মূর্ছনা এবং গুমরানো। পাড়ের পাথরগুলো প্রায় দেখার পূর্বেই সে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ; রাত্রি অতখানি শান্ত না হলে ঢেউগুলো তাকে আছাড় মেরে টুকুরো টুকরো করে দিত। অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে সে কোনো গতিকে ঢেউয়ের দ' থেকে নিজেকে টেনে তুললো। এবড়ো খেবড়ো পাথরের পাড় বেরিয়ে এসেছে নিরেট অন্ধকার থেকে। দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে উপরের দিকে চড়তে আরম্ভ করলো। হাত তার ছড়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপরের সমভূমিতে এসে পৌঁছল। গভীর জঙ্গল সেই পাথুরে পাড়ের শেষ সীমা অবধি পৌঁচেছে। এই জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর তার জন্য অন্য কোনো বিপদ আছে কি না, সে চিন্তা রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অন্তত তখন উদয় হল না। তার মনে তখন শুধু ঐটুকু যে, সে তার শত্রু সমুদ্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে আর তার সর্বাঙ্গে অসীম ক্লান্তি। জঙ্গলের প্রান্তে সে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ে তার জীবনের গভীরতম নিদ্রায় ডুবে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে অপরাহ্ন শেষ হয় হয়। নিদ্রা তাকে নবীন জীবন রস দিয়েছে আর তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় পেট কামড়াতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আনন্দের সঙ্গেই সে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখলো।

রেন্‌স্‌ফর্ড চিন্তা করলো ; 'যেখানে পিস্তলের শব্দ হয় সেখানে মানুষ আছে। আর যেখানে মানুষ আছে সেখানে খাদ্যও আছে। কিন্তু প্রশ্ন, কি রকমের মানুষ এরকম ভীষণ জায়গায় থাকে—এ চিন্তাও তার মনে উদয় হল। কারণ চোখের সামনেই একটানা আঁকাবাঁকা শাখা, এবড়ো থেবড়ো জড়ানো গুল্মলতা—একেবারে পাড় পর্যন্ত।

ঠাসবুনোটের লতাপাতা আর গাছের ভিতর দিয়ে সে সামান্যতম পায়ে চলার চিহ্ন বা পথও সে দেখতে পেল না। তার চেয়ে একেবারে পাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের কাছে কাছে এগিয়ে যাওয়াই সহজ। হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে এগুতে লাগলো। যেখানে সে প্রথম পাড়ে নেমেছিল তার অদূরেই সে দাঁড়ালো।

নিচের ঝোপে কোনো আহত প্রাণী—চিহ্ন থেকে মনে হল বড় আকারেরই—আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়েছে। জঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়ে গিয়েছে আর শ্যাওলা থেঁৎলে গিয়েছে। একটা জায়গা রক্তরাঙা একটু দূরেই কি একটা চকচকে জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তুলে দেখলে কার্তুজের খোল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আপন মনে বললে, বাইশ নম্বরের। কি রকম অদ্ভুত ঠেকছে। আর ঐ শিকারটা বেশ বড় ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। খুবই ঠাণ্ডা মাথার শিকারী ছিল বলতে হবে যে তার সঙ্গে ঐ ছোট্ট হাতিয়ার নিয়ে মোকাবেলা করলো। আর এটাও তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জন্তুটা বেশ লড়াইও দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, প্রথম যে তিনটে শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম তখন শিকারী তাকে দেখতে পেয়ে তিনটে গুলি ছুঁড়ে তাকে জখম করেছিল। তার পর তার পালিয়ে যাবার চিহ্ন ধরে ধরে এখানে এসে তাকে খতম করেছে। শেষ আওয়াজ যেটা শুনতে পেয়েছিলুম সেটা সে-ই।

রেন্‌স্‌ফর্ড জমিটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে যা দেখতে পাবার

আশা করেছিল তাই পেল—শিকারীর জুতোর চিহ্ন। সে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জুতোর চিহ্ন সেই দিকেই গিয়েছে। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় সে এগিয়ে চললো। কখনো বা পচা গাছের গুঁড়ি বা আধখসা পাথরে সে পিছলে যাচ্ছিল, কিন্তু অগ্রসর হচ্ছিল ঠিকই। দ্বীপের উপর তখন রাত্রির অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড যখন প্রথম আলোগুলো দেখতে পেল তখন ঠাণ্ডা অন্ধকার সমুদ্র আর জঙ্গলটাকে কালোয় কালোময় করে দিচ্ছিল। বেলাভূমির একটা বেঁকে-যাওয়া জায়গায় মোড় নিতে সে সেগুলো দেখতে পেল এবং প্রথমটায় তার মনে হয়েছিল সে কোনো গ্রামের কাছে এসেছে—কারণ আলো দেখতে পেয়েছিল অনেকগুলো। কিন্তু ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে বিস্মিত হল যে সব কটা আলো আসছে একই বিরাট বাড়ি থেকে—প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, তার ছুঁচলো মিনারের মত টাওয়ার উপরের অন্ধকারের দিকে ঠেলে ধরেছে। বিরাট দুর্গের মত রাজপ্রাসাদের (শাটোর) আকার প্রচ্ছায়া তার চোখে ধরা পড়ল এবং দেখল শাটোটি একটি উঁচু জায়গার উপর নির্মিত। তার তিন দিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেখানে কালো ছায়াতে ক্ষুধার্ত সমুদ্র যেন দেওয়ালগুলো ঠোঁট দিয়ে চাটছে।

'মরীচিকাই হবে'---ভাবলে রেন্‌স্‌ফর্ড। কিন্তু যখন সে বাড়িটার ফলকওলা গেটটা খুললো তখন বুঝলো যে সেটা মোটেই মরীচিকা নয়। পাথরের সিঁড়িগুলোও যথেষ্ট বাস্তব; পুরু ভারী পাল্লার দরজাও যথেষ্ট বাস্তব—তার গায়ে রয়েছে দৈত্যমুখাকৃতি কড়া—কিন্তু তবু কেমন যেন সমস্ত জায়গাটার চতুর্দিকে অবাস্তবতার বাতাবরণ।

দরজার কড়া উপরের দিকে তুলে ঘা মারতে গেলে সেটা চড় চড় করলো : রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে হল ওটা যেন কখনো ব্যবহার করা হয় নি। কড়াটা ছেড়ে দিতেই সেটা এমনই সুগুরুগম্ভীর নিনাদ

ছাড়লো যে রেন্‌স্‌ফর্ড নিজেই চমকে উঠলো। তার মনে হল ভিতরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল—দরজা কিন্তু খুললো না। সে তখন আবার কড়া তুলে ছেড়ে দিল। তখন এমনই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল যে তার মনে হল যে দরজাটা যেন স্প্রিং দিয়ে তৈরী। ঘরের ভিতর থেকে সোনালী অত্যুজ্জ্বল আলোর বন্যা ধারা তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। তার ভিতর দিয়ে রেন্‌স্‌ফর্ড সর্বপ্রথম যা দেখতে পেল সেটা তার জীবনের এ পর্যন্ত দেখার মধ্যে সর্ববৃহৎ মনুষ্য কলেবর —বিরাট দৈত্যের মত আকার প্রকার, নিরেট দড় মালে তৈরী, আর কোমর অবধি নেমে এসেছে কালো দাড়ি। তার হাতে লম্বা নালওলা রিভলভার আর সেটা সে নিশান করেছে সোজা রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকের দিকে।

সেই দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি ছোট্ট চোখ রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয় পেয়ো না'—বলে রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিত হাস্য করলেন; তার মনে আশা ছিল যে ঐ স্মিতহাস্য লোকটার মনের সন্দেহ দূর করে দেবে। 'আমি ডাকাত নই। একটা ইয়টা থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার নাম সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড—নিউ ইয়র্কের।'

কিন্তু লোকটার ভীতি উৎপাদক দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হল না। রিভলভারটা নড়ন-চড়ন না করে ঠিক তেমনি তার বুকের দিকে নিশান করে রইল, যেন দৈত্যটা পাথরে তৈরী। রেন্‌স্‌ফর্ডের কথাগুলো যে সে বুঝতে পেরেছে তারও কোনো চিহ্ন দেখা গেল না —এমন কি সে আদপেই শুনতে পেয়েছে কি না তা-ই বোঝা গেল না। লোকটার পরনে কালো উর্দি—তার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের আস্ত্রাখান লোমের ঝালর।

রেন্‌স্‌ফর্ড আবার শুরু করলে, 'আমি নিউ ইয়র্কের সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি একটা ইয়ট থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার

ক্ষিধে পেয়েছে।'

লোকটা উত্তরে শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের ঘোড়াটা তুললো। তার পর রেন্‌স্‌ফর্ড দেখলো যে, লোকটার খালি হাতখানা মিলিটারি সেলাম দেবার কায়দায় কপাল ছুঁলো, এক জুতো দিয়ে অন্য জুতো ক্লিক করে এটেনশনে দাঁড়ালো। আরেক জন লোক চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। ইভনিং ড্রেস পরা একদম খাড়া, পাতলা ধরনের লোক।

'বিখ্যাত শিকারী সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ডকে আমার বাড়িতে শুভাগমন জানাতে পেরে আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি।' চোস্ত খানদানী গলায় লোকটি কথাগুলি বললেন। তাতে বিদেশী উচ্চারণের সামান্য আমেজ ছিল বলে কথাগুলো যেন আরো সুস্পষ্ট, সুচিন্তিত বলে মনে হল।

আপনা-আপনি যেন রেন্‌স্‌ফর্ড তার সঙ্গে করমর্দন করলে।

লোকটি বুঝিয়ে বললেন, 'তিব্বতে বরফের চিতে বাঘ শিকার সম্বন্ধে আমি আপনার বই পড়েছি, বুঝলেন তো। আমার নাম জেনারেল জারফ।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম ধারণাই হল যে লোকটি অসাধারণ সুপুরুষ। দ্বিতীয় হল যে জেনারেলের চেহারায় যেন এক অপূর্ব অনন্যতা, প্রায় বলা যেতে পারে বিচিত্র ধরন রয়েছে। লোকটি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন, কারণ তাঁর চুল ধবধবে সাদা কিন্তু তাঁর ঘন ভুরু, আর মিলিটারি কায়দার উপরের দিকে ছুঁচলো গোফ মিশমিশে কালো— যেন ঠিক সেই অন্ধকারের কালো যার ভিতর থেকে রেন্‌স্‌ফর্ড এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাঁর চোখ দুটোও মিশমিশে কালো আর অত্যন্ত উজ্জ্বল। গালের হাড় দুটো তাঁর উঁচু, নাকটি টিকল আর মুখ শীর্ণ ধরনের ঈষৎ বাদামী—এ ধরনের চেহারা হুকুম দিতে অভ্যস্ত—খানদানী লোকের চেহারা। জেনারেল সেই উর্দি-পরা

দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে ইশারা করাতে সে তার পিস্তল নামিয়ে নিয়ে তাঁকে সেলুট করে চলে গেল।

জেনারেল বললেন, 'ইভানের গায়ে অসুরের মত অবিশ্বাস্য শক্তি, কিন্তু বেচারির কপাল মন্দ—সে বোবা আর কালা। সরল প্রকৃতির লোক, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার জাতের আর পাঁচ জনের মত একটুখানি বর্বর।'

'লোকটা কি রাশান?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করাতে তার লাল ঠোঁট আর ছুঁচলো দাঁত দেখা দিল। বললেন, 'কসাক। আমিও।' তার পর বললেন, 'চলুন, এখানে আর কথাবার্তা নয়। আমরা পরে সেটা করতে পারবো। আপনার এখন প্রয়োজন জামাকাপড়, আহারাদি এবং বিশ্রাম। সব পেয়ে যাবেন। এ জায়গাটি পরিপূর্ণ শান্তিময়।'

ইভান আবার দেখা দিল। জেনারেল তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, শুদ্ধমাত্র ঠোঁট নেড়ে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে।

জেনারেল বললেন, 'আপনি দয়া করে ইভানের সঙ্গে যান। আপনি যখন এলেন তখন আমি সবে মাত্র ডিনারে বসেছিলুম। এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার জামাকাপড় আপনার গায়ে ফিট করবে মনে হচ্ছে।'

বরগাওলা বিরাট এক বেডরুম, টোপরওলা যে বিছানা তাতে ছ'জন লোক শুতে পারে—সেখানে গিয়ে পৌছল রেন্‌স্‌ফর্ড নীরব দৈত্যের পিছনে পিছনে। ইভান একটি ইভনিং ড্রেস বের করে দিলে। পরার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড লক্ষ্য করলো স্যুটে লণ্ডনের যে দর্জির নাম সেলাই করা রয়েছে তারা সাধারণত ডিউকের নিচের পদবীর কারো জন্য স্যুট সেলাই করে না।

যে ডাইনিং রুমে ইভান তাকে নিয়ে গেল সেটাও বহুদিক দিয়ে লক্ষণীয়। ঘরটায় যেন ছিল মধ্যযুগীয় আড়ম্বর। দেয়ালে ওক

কাঠের আস্তর, উঁচু ছাদ, বিরাট খাবার টেবিলে দু'কুড়ি লোক খেতে পারে—এসব সামন্তযুগের কোনো ব্যারনের হল্‌ঘরের মত দেখাচ্ছিল। দেয়ালে লাগানো ছিল নানা প্রকারের পশুর মাথা—সিংহ, বাঘ, হাতী, ভালুক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বৃহৎ নমুনা রেন্‌স্‌ফর্ড ইতিপূর্বে আর কখনো দেখে নি। সেই বিরাট টেবিলে জেনারেল একা বসে।

জেনারেল যেন প্রস্তাব করলেন, 'একটা ককটেল খাবেন তো, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড ?' ককটেলটি আশ্চর্য রকমের ভালো এবং রেন্‌স্‌ফর্ড আরো লক্ষ্য করলো যে টেবিলের সাজসরঞ্জামও সর্বোত্তম পর্যায়ের—টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন, স্ফটিকের পাত্রাদি, রূপো এবং চীনেমাটির বাসনকোষন—সব কিছুই।

তাঁরা ঘন মশলাওলা সরে মাখানো বর্শ্‌ স্যুপ খাচ্ছিলেন। এ স্যুপটি রাশানদের বড়ই প্রিয়। যেন আধো মাফ চাওয়ার ভঙ্গীতে জেনারেল জারফ বললেন, 'সভ্যতা যে-সব সুখ-সুবিধা দেয় আমরা এখানে সেগুলো রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দি। ত্রুটিবিচ্যুতি হলে মাফ করবেন। জনগণের গমনাগমনের বাঁধা রাস্তা থেকে আমরা যথেষ্ট দূরে—বুঝলেন তো ? আপনার কি মনে হয় অনেক দূরের সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেছে বলে শ্যাম্পেনের স্বাদ খারাপ হয়ে গিয়েছে ?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'একদম না।' তার মনে হল জেনারেলটি অতিশয় অমায়িক ও যত্নশীল অতিথিসেবক—সত্যিকার বিশ্ব-নাগরিক। শুধু জেনারেলের একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অস্বস্তির সঞ্চার করছিল। যখনই প্লেট থেকে মুখ তুলে সে তাঁর দিকে তাকিয়েছে তখনই দেখেছে তিনি যেন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, সূক্ষ্মতম ভাবে যাচাই করে নিচ্ছেন।

জেনারেল জারফ বললেন, 'আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন

আমি আপনার নাম চিনলুম কি করে। বুঝেছেন কি না, ইংরিজি, ফরাসী এবং জর্মন ভাষায় যেসব শিকারের বই বেরোয় আমি তার সব কটাই পড়ি। আমার জীবনের ব্যসন মাত্র একটি, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড,—শিকার।'

সুপক্ক ফিলে মিন্নো খেতে খেতে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আপনার শিকারের মাথাগুলো চমৎকার। ঐ যে কেপ মহিষের মাথা—এত বড় মাথা আমি কখনো দেখি নি।'

'ও! ঐ ব্যাটা! পূরো দস্তুর দানব ছিল সে।'

'আপনার দিকে তেড়ে এসেছিল নাকি?'

'একটা গাছের উপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমার খুলিতে ফ্রেক্‌চার হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি ব্যাটাকে ঘায়েল করি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে বড় শিকারের ভিতর কেপের মোষই সব চেয়ে বিপজ্জনক শিকার।'

এক লহমার তরে জেনারেল কোন উত্তর দিলেন না—তার লাল ঠোঁট দিয়ে তিনি সেই বিচিত্র স্মিতহাস্য হেসে যেতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'না, আপনি ভুল করেছেন, স্যর! কেপ মহিষ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিকার নয়।' তিনি মদের গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিলেন। 'এই দ্বীপে আমার খাস মৃগয়া ভূমিতে আমি তার চেয়েও বিপজ্জনক শিকার করে থাকি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোলে, 'এই দ্বীপে বড় শিকার আছে নাকি?'

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'সব চেয়ে বড়।'

'সত্যি?'

'ও! প্রকৃতিদত্ত নয়—নিশ্চয়ই। আমাকে স্টক্ করতে হয়।'

'আপনি কি আমদানি করেছেন, জেনারেল? বাঘ?'

জেনারেল স্মিতহাস্য করে বললেন, 'না। বাঘ শিকারে আমার

আর কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই—কয়েক বছর হয়ে গেল। বাঘের মুরোদ কতখানি তার শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। বাঘ আর আমাকে উত্তেজনা দিতে পারে না—কোনো সত্যকার বিপদে ফেলতে পারে না। আমি জীবন ধারণ করি বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড।'

জেনারেল তাঁর পকেট থেকে একটি সোনার সিগারেট-কেস বের করে তার অতিথিকে রুপালি টিপওলা একটি লম্বা কালো সিগারেট দিলেন ; সুগন্ধি সিগারেট,—আর ধূপের মত সৌরভ ছাড়ে।

জেনারেল বললেন, 'আমরা অত্যুত্তম শিকার করবো—আপনাতে আমাতে। আপনার সঙ্গ পেলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করবো।'

'কিন্তু কি ধরনের শিকার—'

'বলছি আপনাকে। আপনার খুব মজা লাগবে—আমি জানি। সবিনয়ে বলছি, আমি একটি নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। আপনাকে আরেক গেলাস পোর্টওয়াইন দেব কি ?'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

জেনারেল দুটি গেলাস পূর্ণ করে বললেন, 'ভগবান কোনো কোনো লোককে কবি বানান। কাউকে তিনি রাজা বানান, কাউকে ভিখিরি। আমাকে তিনি বানিয়েছেন শিকারী। আমার পিতা বলতেন, আমার হাতখানি বন্দুকের ঘোড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই ধনী ; ক্রিমিয়াতে তাঁর আড়াই লক্ষ একর জমি ছিল এবং শিকারে ছিল তাঁর চরম উৎসাহ। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তিনি আমাকে ছোট্ট একটি বন্দুক দেন—বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেটি মস্কোতে তৈরী করা হয়েছিল—চড়ুই শিকার করার জন্য। আমি যখন ঐটে দিয়ে তাঁর কতকগুলো জাত টার্কি মুর্গী মেরে ফেলি তিনি তখন আমাকে কোনো সাজা দেন নি ; আমার

তাগের তিনি প্রশংসা করলেন। দশ বছর বয়সে ককেসাসে আমি আমার প্রথম ভালুক মারি। আমার সমস্ত জীবন একটানা একটা শিকার। আমি ফৌজে যোগ দি—খানদানী ঘরের ছেলে মাত্রের কাছ থেকেই সে যুগে এই প্রত্যাশা করা হত—এবং কিছু কালের জন্য আমি একটা ঘোড়-সওয়ার কসাক ডিভিশনের কমাণ্ডারও হয়েছিলুম কিন্তু আমার সত্যকার আকর্ষণ সর্বসময়ই ছিল শিকার। সর্বদেশে আমি সর্বপ্রকারের জন্তু শিকার করেছি। আমি ক'টা জন্তু মেরেছি সেটা আপনাকে গুনে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

রাশা যখন তছনছ হয়ে গেল তখন আমি সে দেশ ছাড়লুম। কারণ জারের একজন অফিসারের পক্ষে তখন সেখানে থাকা অবিবেচনার কাজ হত। অনেক খানদানী রাশান সর্বস্ব হারালেন। আমি কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর মার্কিন শেয়ার কিনে রেখেছিলুম। তাই আমাকে কখনো মণ্টেকার্লোতে চায়ের দোকান করতে হবে না, বা প্যারিসে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হতে হবে না। অবশ্য আমি শিকার চালিয়ে যেতে লাগলুম। আপনাদের রকি অঞ্চলে গ্রিজলি, গঙ্গায় কুমীর, পূর্ব আফ্রিকায় গণ্ডার। আফ্রিকাতেই ঐ কেপ মহিষ আমাকে জখম করে ছ'মাস শয্যাশায়ী করে রাখে। সেরে ওঠা মাত্রই আমি আমাজনে জাগুয়ার শিকার করতে বেরলুম, কারণ আমি শুনেছিলুম যে তারা অসাধারণ ধূর্ত হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কসাক বললেন, 'মোটেই না। বুদ্ধি সজাগ রাখলে আর জোরদার রাইফেল থাকলে তারা কোনো শিকারীর সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না। আমি মর্মান্তিক নিরাশ হলুম। এক রাত্রে আমি তাঁবুতে শুয়ে অসহ্য মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ঢুকলো। শিকার আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। এবং মনে রাখবেন শিকারই ছিল আমার জীবন। শুনেছি, মার্কিন দেশে ব্যবসায়ীরা আপন ব্যবসা ছেড়ে দিলে প্রায়ই যেন টুকরো টুকরো

হয়ে ভেঙে পড়েন, কারণ ঐ ব্যবসায়ই ছিল ওদের জীবন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

জেনারেল স্মিতহাস্য করলেন। 'আমার কিন্তু ভেঙে পড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমাকে তা হলে কিছু একটা করতে হয়। দেখুন, আমার হল গিয়ে বিশ্লেষণকারী মন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। নিঃসন্দেহ সেই কারণেই আমি শিকারের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় এত আনন্দ পাই।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'এতে কোনো সন্দেহই নেই, জেনারেল জারফ।'

'তাই আমি নিজেকে শুধালুম, শিকার আমাকে এখন সম্মোহিত করে না কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, মিস্টার রেন্‌স্‌-ফর্ড, এবং আমি যতখানি শিকার করেছি আপনি ততখানি করেন নি কিন্তু তবু আপনি হয়তো উত্তরটা অনুমান করতে পারবেন।'

'সেটা কি?'

'সোজাসুজি এই; শিকার তখন আমার কাছে আর "হয় হারি নয় জিতি" ধরনের বিষয় নয়। আমি প্রতিবারেই আমার শিকারকে খতম করছি। সব সময়। প্রতি বারেই। সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে গিয়েছে। আর পরিপূর্ণতার মত একঘেয়েমি আর কিছুতেই নেই।'

জেনারেল আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

'কোনো শিকারেরই আর তখন আমাকে এড়াতে পারবার সৌভাগ্য হত না। আমি দেমাক করছি না। এ যেন একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা। পশুটার কি আছে?—তার পা আর সহজাত প্রবৃত্তি। অন্ধ প্রবৃত্তি তো বুদ্ধির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে না। এ চিন্তা যখন আমার মনে উদয় হল সে সময়টা আমার পক্ষে বিষাদময়, আপনাকে সত্যি বলছি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড টেবিলের উপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গোগ্রাসে তাঁর কথা গিলছে।

জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'আমাকে কি করতে হবে, সেটা যেন একটা অনুপ্রেরণার মত আমার কাছে এল।'

'এবং সেটা কি?'

জেনারেল আত্মপ্রসাদের স্মিত হাস্য করলেন। মানুষ কোনো প্রতিবন্ধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটাকে অতিক্রম করতে পারলে যে মৃদু হাসি হাসে। বললেন, 'শিকার করার জন্য আমাকে নূতন পশু আবিষ্কার করতে হল।'

'নূতন পশু? আপনি ঠাট্টা করছেন।'

জেনারেল বললেন, 'মোটেই না। আমি শিকারের ব্যাপার নিয়ে কখনো মস্করা করিনে। আমার প্রয়োজন ছিল একটা নূতন পশুর। পেলুমও একটা। তাই আমি এই দ্বীপটা কিনলুম, বাড়িটা তৈরী করলুম এবং এখানে আমি আমার শিকার করি। আমার কাজের জন্য এই দ্বীপটি একেবারে সর্বাঙ্গ সুন্দর—জঙ্গল আছে, তার ভিতর পায়ে চলাফেরার রীতিমত গোলক ধাঁধা রয়েছে, পাহাড় আছে, জলাভূমি—'

'কিন্তু সেই পশুটা, জেনারেল জারফ?'

জেনারেল বললেন, 'ও! এই দ্বীপ আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে উত্তেজনাদায়ক শিকার করতে দিয়েছে। অন্য যে কোনো শিকারের সঙ্গে এর তুলনা এক লহমার তরেও হয় না। আমি প্রতিদিন শিকার করি এবং একঘেয়েমি আমার কাছেই আসতে পারে না। কারণ আমার শিকার এমনই ধরনের যে তার সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই চালাতে পারি।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের মুখে হতভম্ব ভাব।

'আমি চেয়েছিলুম শিকারের জন্য একটা আদর্শ পশু। তাই

আমি নিজেকে শুধালুম, "আদর্শ শিকারের কোন্ কোন্ গুণ থাকে ?" তার উত্তর স্বভাবতই ; "তার সাহস, চাতুর্য, এবং সর্বোপরি সে যেন বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে" ।'

রেন্স্ফর্ড আপত্তি জানালে, 'কিন্তু কোনো পশুরই তো বিচার-শক্তি নেই।'

জেনারেল বললেন, 'মাই ডিয়ার দোস্ত, একটা পশুর আছে।'

'কিন্তু আপনি তো সত্যিই সেটা বলতে—' রেন্স্ফর্ডের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'না কেন ?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে আপনি যথার্থ কথা বলছেন, জেনারেল জারফ। এটা একটা বীভৎস রসিকতা।'

'আমি যথার্থ কথা বলবো না কেন ? আমি শিকারের কথা বলছি !'

'শিকার ? ভগবান সাক্ষী, আপনি যা বলছেন সে তো খুন।'

জেনারেল পরিপূর্ণ খুশ মেজাজে হেসে উঠলেন। রেন্স্ফর্ডের দিকে তিনি মজার সঙ্গে তাকালেন। বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে আপনার মত সভ্য ও আধুনিক যুবা—আপনাকে দেখলে সেই তো মনে হয়—মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধে আপনার অভিজ্ঞতা—'

রেন্স্ফর্ড কঠিন কণ্ঠে বললো, 'নৃশংস খুন ক্ষমা করতে দেয় না।'

উচ্চহাস্যে জেনারেল দুলতে লাগলেন। বললেন, 'কী অসাধারণ মজার মানুষ আপনি ! আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে—এমন কি আমেরিকাতেও—এ ধরনের হাবাগোবা সরল বিশ্বাসী—আর যদি অনুমতি দেন্ তবে বলি—মধ্য-ভিক্টোরীয় ধারণার মানুষ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে কি না, কোনো সন্দেহ নেই আপনার পূর্বপুরুষ

গোঁড়া শুদ্ধাচারী (প্যুরিটান) ছিলেন। কত না আমেরিকাবাসীর পিতৃপুরুষ এই সম্প্রদায়ের। আমি বাজী ধরছি, আমার সঙ্গে শিকারে বেরুলে এসব ধারণা আপনি ভুলে যাবেন। আপনার অদৃষ্টে খাঁটি নূতন রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সঞ্চিত রয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি শিকারী ; খুনী নই।'

বিচলিত না হয়ে জেনারেল বললেন, 'হায়, আবার সেই অপ্রিয় শব্দ! কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারবো, আপনার নৈতিক দ্বিধা ভিত্তিহীন।'

'সত্যি ?'

'জীবন জিনিসটাই শক্তিমানের জন্য, বেঁচে থাকবে শক্তিমান, এবং প্রয়োজন হলে সে জীবন নিতেও পারে। দুর্বলদের এই পৃথিবীতে রাখা হয়েছে শক্তিমানকে আনন্দ দেবার জন্য। আমি শক্তিমান। আমি আমার বিধিদত্ত উপহার কাজে খাটাবো না কেন ? আমি যদি শিকার করতে চাই তবে করবো না কেন ? তাই আমি দুনিয়ার যত আবর্জনাকে শিকার করি—রদ্দি জাহাজের খালাসী, মাঝিমাল্লা, কৃষ্ণাঙ্গ, চীনা, শ্বেতাঙ্গ, দুআঁসলা—একটি অবিমিশ্র রক্তের ঘোড়া বা কুকুর এদের কুড়িটার চেয়ে মূল্যবান।'

রেন্‌স্‌ফর্ড গরম হয়ে বললে, 'কিন্তু তারা মানুষ।'

জেনারেল বললেন, 'হুবহু খাঁটি কথা। সেই কারণেই আমি ওদের ব্যবহার করি। আমি তাতে আনন্দ পাই। তারা বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, অবশ্য যার ঘটে যেমন বুদ্ধি সেইটুকু দিয়ে। তাই তারা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু শিকারের জন্য মানুষ যোগাড় করেন কি প্রকারে ?' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধালে।

ক্ষণতরে জেনারেলের বাঁ চোখের পাতাটি নড়ে গিয়ে যেন কটাক্ষ মারলো। উত্তর দিলেন, 'এ দ্বীপের নাম "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ।"

কখনো কখনো ঝঞ্ঝামথিত ক্রুদ্ধ সমুদ্রদেব আমার কাছে ওদের পাঠিয়ে দেন। যখন ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না, তখন আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করি। আমার সঙ্গে জানলার কাছে আসুন।'

রেন্‌স্‌ফোর্ড জানলার কাছে এসে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকালো।

জেনারেল বলে উঠলেন, 'লক্ষ্য করুন! ঐ ওখানে বাইরে।' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধু নিশির অন্ধকার দেখতে পেল। তারপর যেই জেনারেল একটি বোতাম টিপলেন অমনি দূব সমুদ্রে একাধিক আলোর ছটা দেখতে পেল।

জেনারেল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'ঐ আলোগুলোর অর্থ, ওখানে চ্যানেল পথ আছে—যেখানে সে জাতীয় কিছুই নেই। বিরাট বিরাট পাথর তাদের ক্ষুরের মত ধারালো পাশ নিয়ে হা করে ঘাপটি মেরে বসেছে সমুদ্র-দৈত্যের মত। তারা অতি অক্লেশে এক-খানা জাহাজ গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারে—এই যে রকম আমি অক্লেশে এই বাদামটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।' তিনি শক্ত কাঠের মেঝের উপর একটি বাদাম ফেলে দিয়ে জুতোর হিল দিয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলেন। যেন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিতান্ত কথায় কথায় বললেন, 'আমার ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে সভ্য থাকবার চেষ্টা করি।'

'সভ্য? আর আপনি গুলি করে মানুষ খুন করেন?'

জেনারেলের কালো চোখে ক্রোধের সামান্য রেশ দেখা দিল। কিন্তু সেটা এক সেকেণ্ডের তরে। অতি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'হায় কপাল! কী অদ্ভুত নীতিবাগীশ তরুণই না আপনি। আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি আপনি যা বলতে চাইছেন আমি সে রকম কিছুই করি না। সেটা হবে বর্বরতা। আমি আমার অতিথিদের চরম খাতির যত্ন করে থাকি। তারা প্রচুর খাদ্য পায়, প্রয়োজনীয়

কায়িক পরিশ্রম করে শরীর সুস্থ সবল রাখতে পায়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার হয়ে ওঠে। কাল আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'মানে ?'

মুচকি হেসে জেনারেল বললেন, 'কাল আমরা আমার ট্রেনিং স্কুল দেখতে যাবো। ইস্কুলটা মাটির নিচের সেলারে। উপস্থিত সেখানে আমার প্রায় ডজন খানেক ছাত্র আছে। তারা এসেছে হিস্‌পানি বোট "সানলুকার" থেকে—জাহাজখানার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা ঐ হোথায় পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব কটাই অতিশয় নিরেস, বাজে-মার্কা—ডেকের উপর চলাফেরাতে যতখানি অভ্যস্ত জঙ্গলে ততখানি নয়।'

তিনি হাত তুলতেই ইভান—সে-ই ওয়েটারের কাজ করছিল—গাঢ় টার্কিশ কফি নিয়ে এল। রেন্‌স্‌ফোর্ড অতি কষ্টে নিজেকে কথা বলা থেকে ঠেকিয়ে রাখছিল।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে খোলাখুলি ভাবে জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে শিকারের ব্যাপার। আমি এদের একজনকে আমার সঙ্গে শিকারে যেতে প্রস্তাব করি। আমি তাকে যথেষ্ট খাদ্য আর উৎকৃষ্ট একখানা শিকারের ছোরা দিয়ে আমার তিন ঘন্টা আগে বেরুতে দিই। পরে বেরই আমি, সবচেয়ে ছোট ক্যালিবারের আর সবচেয়ে কম পাল্লার মাত্র একটি পিস্তল নিয়ে। পুরো তিন দিন যদি সে আমাকে এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তবে সে জিতলো। আর আমি যদি তাকে খুঁজে পাই'—জেনারেল মুচকি হেসে বললেন, 'তবে সে হারলো।'

'সে যদি শিকার হতে রাজী না হয় ?'

'ও! সেটা বাছাই করা নিশ্চয়ই আমি তার হাতে ছেড়ে দি। সে যদি না খেলতে চায় তবে খেলবে না। সে যদি শিকারে যেতে রাজী না হয় তবে আমি তাকে ইভানের হাতে সমর্পণ করি। ইভান

একদা মহামান্য শ্বেত জারের সরকারি চাবুকদারের সম্মানিত চাকরি করেছে। এবং খেলাধূলা, শিকার বাবদে সে আপন নিজস্ব ধারণা পোষণ করে। কোনো ব্যত্যয় হয় না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, কোনো ব্যত্যয় হয় না। তারা সব্বাই আমার সঙ্গে শিকার করাটাই পছন্দ করে নেয়।'

'আর যদি তারা জিতে যায়?'

জেনারেলের মৃদু হাস্য আরো বিস্তৃত হল। বললেন, 'আজ পর্যন্ত আমি হারি নি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আপনি ভাববেন না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, আমি দেমাক করছি। বস্তুত এদের বেশীর ভাগই অতিশয় সরল সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে দু-একটা দুঁদে দেখা দেয় বটে। একজন প্রায় জিতে গিয়েছিল। শেষটায় কুকুরগুলোকে ব্যবহার করতে হয়েছিল আমাকে।'

'কুকুর?'

'এদিকে আসুন; আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেনারেল রেন্‌স্‌ফর্ডকে একটা জানলার কাছে নিয়ে গেলেন। জানলার আলোগুলো নিচের আঙিনায় আলো-ছায়ার হিজিবিজি প্যাটার্ন তৈরী করছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড সেখানে ডজন খানেক বিরাট আকারের কালো প্রাণীকে নড়াচড়া করতে দেখলো। তারা তার দিকে মুখ তুলতেই তাদের চোখে সবুজ রঙের ঝিলিমিলি খেলে গেল।

জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'আমার মতে উত্তম শ্রেণীর। প্রতি রাত্রে সাতটার সময় এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেউ যদি আমার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে—কিংবা বেরিয়ে যাবার—তবে তার পক্ষে সেটা শোচনীয় হতে পারে।' জেনারেল গুন গুন করে ফলি বের্জেরের একটি গানের কলি ধরলেন।

জেনারেল বললেন, 'এখন আমি যে নূতন মাথাগুলো জমিয়েছি সেগুলো আপনাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসবেন কি?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আশা করছি, আজকে রাত্রের মত আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার শরীরটা আদপেই ভালো যাচ্ছে না।'

জেনারেল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, 'আহা, তাই নাকি! কিন্তু সেইটেই তো স্বাভাবিক—এতখানি দীর্ঘ সাঁতার কাটার পর। আপনার প্রয়োজন রাত্রিভর শান্তিতে সুনিদ্রা। কাল তাহলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন—আমি বাজী ধরছি। তখন আমরা শিকারে বেরুবো—কি বলেন? কালকের শিকার উত্তম হবে বলেই আমি আশা করছি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড তখন তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে।

জেনারেল পিছন থেকে গলা তুলে বললেন, 'আজ যে আপনি আমার সঙ্গে শিকারে বেরুতে পারছেন না তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আজ ভালো শিকারের আশা আছে—বড় সাইজের, তাগড়া নীগ্রো। দেখে তো মনে হচ্ছে অন্ধিসন্ধি জানে—আচ্ছা, গুড নাইট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড! আশা করি রাত্রির পুরো বিশ্রাম পাবেন।'

বিছানাটা ছিল খুব ভাল, বিছানায় পরার পাজামা কুর্তা সব চেয়ে নরম রেশমের তৈরী, তার সর্ব পেশী-স্নায়ুতে ক্লান্তি, কিন্তু তবুও নিদ্রার ওষুধ দিয়ে সে তার মগজটাকে শান্ত করতে পারলো না—পড়ে রইল দুটো খোলা চোখ মেলে। একবার তার মনে হল, তার ঘরের সামনের করিডরে কার যেন চুপিসাড়ে চলার শব্দ শুনতে পেল। সে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো; খুললো না। জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরের দিকে তাকালো। তার ঘরটা ছিল উঁচু

টাওয়ারগুলোর একটাতে। বাড়ির আলো তখন নিভে গিয়েছে। নীরব, অন্ধকার। শুধু আকাশে এক ফালি পাণ্ডুর চাঁদ; তারই ফ্যাকাশে আলোতে সে আঙিনার আবছায়া দেখতে পাচ্ছিল। কতকগুলো নিস্তব্ধ কালো আকারের কি যেন সেখানে আনাগোনা করে আলো-ছায়ার আলপনা কাটছিল; কুকুরগুলো জানলাতে তার শব্দ শুনতে পেয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষায় তাদের সবুজ চোখ তুলে তাকালো। রেনস্‌ফর্ড বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে বহু পদ্ধতিতে চেষ্টা করলো। তার পর যখন কিছুটা ফল পেয়ে, পাতলা ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে—ঠিক ভোরের দিকে তখন অতি দূর জঙ্গলের ভিতর সে পিস্তল ছোড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল।

দুপুরের খাওয়ার পূর্বে জেনারেল জারফ দেখা দিলেন না। লাঞ্চে যখন এলেন তখন তাঁর পরনে গ্রামাঞ্চলের জমিদারের নিখুঁত টুইডের স্যুট। তিনি রেন্‌স্‌ফর্ডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন, 'আর আমার কথা যদি তোলেন, তবে বলি আমার ঠিক ভালো যাচ্ছে না। আমার মনে দুশ্চিন্তা, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল রাত্রে আমি আমার পুরোনো ব্যারামের চিহ্ন অনুভব করলুম।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের চাউনিতে প্রশ্ন দেখে জেনারেল বললেন, 'এক-ঘেয়েমি। বৈচিত্র্যহীনতার অরুচি।'

আপন প্লেটে আবার খানিকটা ক্রেপ স্যুজেৎ তুলে নিয়ে জেনারেল বুঝিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে ভালো শিকার হয় নি। লোকটার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। সে এমনি সোজাসুজি চলে গিয়েছিল যে তাতে করে কোনো সমস্যারই উদ্ভব হল না। খালাসীগুলো নিয়ে এই হল মুশকিল। একে তো আকাট, তায়

আবার বনের ভিতর চলাফেরার কৌশল জানে না। নিরেট বোকার মত এমন সব করে যা দেখা মাত্রই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারি বিরক্তিজনক। আরেক গেলাস শাবলি চলবে কি মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?'

রেন্‌স্‌ফর্ড দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'জেনারেল, আমি এখ্‌খুনি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

জেনারেল তাঁর দুই ঝোপ ভুরু উপরের দিকে তুললেন; মনে হল তিনি যেন আঘাত পেয়েছেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সে কি দোস্ত! আপনি তো সবে এসেছেন। শিকারও তো করেন নি---'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আজই যেতে চাই।' তার পর দেখে, জেনারেলের কালো চোখ দুটো তার দিকে মরার চোখের মত এক-দৃষ্টে তাকিয়ে তাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হঠাৎ জেনারেল জারফের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বোতল থেকে প্রাচীন দিনের শাবলি ঢাললেন রেন্‌স্‌ফর্ডের গেলাসে। বললেন, 'আজ রাত্রে আমরা শিকারে বেরুবো—আপনাতে আমাতে।'

রেন্‌স্‌ফর্ড ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বললে, 'না জেনারেল; আমি শিকারে যাবো না।'

জেনারেল ঘাড় দুটো তুলে নামিয়ে অসহায় ভাব দেখালেন। বাগানের কাঁচের ঘরে বিশেষ করে ফলানো একটি আঙুর মোলায়েমসে খেতে খেতে বললেন, 'আপনার অভিরুচি, দোস্ত! কি করবেন, না করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে। তবে যদি অনুমতি দেন তবে বলবো, শিকার-খেলা সম্বন্ধে ইভানের ধারণার চেয়ে আমার ধারণা আপনার অধিকতর মনঃপূত হবে।'

যে কোণে ইভান দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে জেনারেল মাথা

নাড়লেন। দৈত্যটা সেখানে তার পিঁপের মত পুরু বুকের উপর দু' বাহু চেপে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে তাকাচ্ছিল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আর্তকণ্ঠে বললো, 'আপনি কি সত্যি বলতে চান—'

জেনারেল বললেন, 'প্যারা দোস্ত! আমি কি আপনাকে বলি নি, শিকার সম্বন্ধে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা সত্য সত্য বলি। কিন্তু এটা আমার খাঁটি অনুপ্রেরণা। আসুন, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে আমি পান করি।'

জেনারেল তাঁর গেলাস উঁচু করে তুলে ধরলেন; কিন্তু রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর দিকে শুধু স্থির নয়নে তাকিয়ে রইল।

সোৎসাহে জেনারেল বললেন, 'আপনি দেখবেন এ শিকার শিকারের মত শিকার। আপনার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির বিপক্ষে। আপনার শক্তি, আপনার লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা—আমার বিরুদ্ধে। মুক্তাকাশের নিচে দাবা খেলা! এবং যে বাজী ধরা হবে তার মূল্যও কিছু কম নয়—কি বলেন?'

'আর যদি আমি জিতি—', রেন্‌স্‌ফর্ডের গলা থেকে যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বেরুল।

জেনারেল জারফ বললেন, 'তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রি অবধি যদি আমি আপনাকে খুঁজে না পাই তবে আমি সানন্দে আপন পরাজয় স্বীকার করে নেব। আমার নৌকা আপনাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কোন শহরের কাছে ছেড়ে আসবে।'

জেনারেল যেন রেন্‌স্‌ফর্ডের চিন্তা পড়ে ফেলে বললেন, 'ও। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ভদ্রলোক এবং শিকারী হিসেবে আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি। অবশ্য আপনাকেও তার বদলে কথা দিতে হবে যে এখানে আপনার আগমন সম্বন্ধে কিচ্ছু বলবেন না।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আদপেই এরকম কোনো কথা দেব না।'

জেনারেল বললেন, 'ও! তাহলে—কিন্তু এখন কেন সে আলোচনা? তিন দিন পরে দুজনাতে এক বোতল ভাভ্ ক্লিকো খেতে খেতে সে আলোচনা করা যাবে, অবশ্য যদি—'

জেনারেল মদে চুমুক দিলেন।

কারবারী লোকের ব্যস্ততা তাঁকে সজীব করে তুললো। রেন্‌স্‌ফর্ডকে বললেন, 'ইভান আপনাকে শিকারের কোটপাতলুন, আহারাদি ও একখানা ছোরা দেবে। আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, আপনি নরম চামড়ার তলিওলা জুতোই পরবেন। ওতে করে চলার পথে দাগ পড়ে কম। এবং পরামর্শ দি, দ্বীপের দক্ষিণ-পূব কোণের বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা মাড়াবেন না। আমরা ওটাকে "মরণ-জলা" নাম দিয়েছি। ওখানে চোরাবালি আছে। এক আহাম্মুখ ঐ দিক দিয়ে চেষ্টা দিয়েছিল। শোকের বিষয় যে, ল্যাজরাস্ তার পিছনে পিছনে যায়। আপনি আমার বেদনাটা কল্পনা করে নিতে পারবেন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি ল্যাজ্-রাস্‌কে ভালোবাসতুম; আমার দলের ঐটেই ছিল সবচেয়ে সরেস ডালকুত্তা। তাহলে, এখন আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। দুপুরে আহার করার পর আমি একটু গড়িয়ে নি। আপনি কিন্তু নিদ্রার ফুরসৎ পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি রওয়ানা হতে চাইবেন। গোধূলি বেলার পূর্বে আমি আপনার পেছনে বেরুবো না। রাত্রিবেলার শিকারে উত্তেজনা অনেক বেশী, দিনের চেয়ে—কি বলেন? আচ্ছা তবে দেখা হবে, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, ও রভোয়া।'

নিচু হয়ে নম্র অভিবাদন জানিয়ে জেনারেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইভান অন্য দরজা দিয়ে ঘরে এল। তার এক বগলে শিকারের খাকি পোশাক, খাবারের হ্যাভারস্যাক্, চামড়ার খাপের ভিতর

লম্বা ফলাগুলা শিকারের ছোরা। তার ডান হাত রক্তরঙের কোমর-বন্ধের ভিতরে গোঁজা রিভলভারের তোলা ঘোড়ার উপর।

দু'ঘন্টা ধরে রেনস্ফর্ড ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন লড়াই ক'রে ক'রে চলেছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেছে, 'আমি মাথা গরম হতে দেব না, আমার মাথা গরম হলে চলবে না।'

শাটোর গেট্ যখন তার পিছনে কড়াক্ করে বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মাথা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রথমটায় তার সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল তার আর জেনারেল জারফের মাঝখানে যতখানি সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে, আর ঐ উদ্দেশ্য মনে রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। যেন এক করাল বিভীষিকা ঘোড়-সওয়ারের জুতোর কাঁটার মত খোঁচা মেরে মেরে তাকে সম্মুখ পানে খেদিয়ে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু এতক্ষণে সে অনেকখানি আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে; সে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার নিজের ও পরিস্থিতিটার বিচার-বিবেচনা করতে লাগলো।

সোজা, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই—কারণ তাতে করে সে সমুদ্রের কাছে গিয়ে মুখোমুখি হবে। সে যেন চতুর্দিকে সমুদ্রের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মাঝখানে; সে যা-ই করুক না কেন, এই ফ্রেমের ভিতরই তাকে সেটা করতে হবে।

রেনস্ফর্ড বিড়বিড় করে বললে, 'দেখি, আমার চলার পথ সে খুঁজে বের করতে পারে কিনা।' এতক্ষণ সে জঙ্গলের কাঁচা পায়ে-চলার-পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে এখন নামলো দিক-দিশেহীন ঘন জঙ্গলের ভিতর। সে অনেকগুলো জটিল ঘোর-প্যাঁচ খেয়ে তার উপর দিয়ে বার বার এলোপাতাড়ি আসা যাওয়া করতে করতে শেয়াল-শিকারের সমস্ত কলকৌশল, আর শেয়ালের এড়িয়ে যাবার তাবৎ ধূর্ত সন্ধি-সুড়ক স্মরণে আনতে লাগলো। সন্ধ্যার

অন্ধকার যখন নামলো তখন সে গভীর জঙ্গলে ভরা একটা টিলার প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। পা দুটো শ্রমক্লান্ত, হাত আর মুখ জঙ্গলের শাখা-প্রশাখার আঁচড়ে ভর্তি। সে বেশ বুঝতে পারলো, এখন তার গায়ে শক্তি থাকলেও এই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে চলাটা হবে বদ্ধ পাগলামি। এখন তার বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। মনে মনে ভাবলো, 'এতক্ষণ আমি শেয়ালের যা করার তাই করেছি, এখন বেরালের খেলা খেলতে হবে।' কাছেই ছিল একটা বিরাট গাছ—মোটা গুঁড়ি আর বিস্তৃত কাণ্ড নিয়ে। অতি সাবধানে সামান্যতম চিহ্ন না রেখে সে গাছ বেয়ে উঠে যেখানে একটা মোটা শাখা গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে সেখানে চওড়া শাখাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে যতখানি পারা যায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। এই বিশ্রান্তি তার বুকে যেন এক নূতন আত্মবিশ্বাস এনে দিল; এমন কি সে অনেকখানি নিরাপত্তাও অনুভব করতে লাগলো। মনে মনে নিজেকে বললে, জেনারেল জারফ যত বড় উৎসাহী শিকারীই হোন না কেন এখানে তিনি তাকে খুঁজে পাবেন না। সে যে গোলক-ধাঁধাঁর প্যাঁচ পিছনে রেখে এসেছে তার জট ছাড়িয়ে অন্ধকারে এই জঙ্গলের ভিতর একমাত্র শয়তানই এগুতে পারবে। কিন্তু হয়তো জেনারেল একটা শয়তানই—

আহত সর্প যে রকম ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, এই উদ্বেগময়ী রজনীও সেই রকম কাটতে লাগলো, এবং জঙ্গলে মৃতা ধরণীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করা সত্ত্বেও রেন্‌স্‌ফর্ডের চোখের পাতায় ঘুম নামলো না। ভোরের দিকে যখন আকাশ ঘোলাটে পাঁশুটে রঙ মাখছিল তখন চমকে-ওঠা একটা পাখীর চিৎকার রেন্‌স্‌ফর্ডের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করলো। কি যেন একটা আসছে ঝাড়-ঝোপের ভিতর দিয়ে—ধীরে, সাবধানে—সেই এলোপাতাড়ি গোলকধাঁধাঁ বেয়ে, ঠিক যেভাবে রেন্‌স্‌ফর্ড এসেছিল। ডালের উপর চ্যাপ্টা

হয়ে শুয়ে পড়ে সে পাতায় বোনা প্রায় কার্পেটের মত পুরু আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যে বস্তু আসছিল সে মানুষ

জেনারেল জারফ! সর্ব চৈতন্য কেন্দ্রীভূত করে, গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। প্রায় ঠিক গাছটার সামনে তিনি দাঁড়ালেন, তার পর মাটিতে হাঁটু গেড়ে জমিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করে রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম রোখ চেপেছিল নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করলো জেনারেলের ডান হাতে ধাতুর তৈরী কি একটা বস্তু—ছোট্ট একটি অটোম্যাটিক পিস্তল।

শিকারী কয়েকবার মাথা নাড়লেন, যেন তিনি ধন্দে পড়েছেন। তার পর সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কেস্ থেকে তাঁর কালো একটা সিগারেট বের করলেন; তার তীব্র সুগন্ধ ভেসে উঠে রেন্‌স্‌ফর্ডের নাকে পৌঁছল।

রেন্‌স্‌ফর্ড দম বন্ধ করে রইল।

জেনারেলের চোখ তখন মাটি ছেড়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। রেন্‌স্‌ফর্ড বরফের মত জমে গিয়েছে, তার সব কটা মাংসপেশী লাফিয়ে পড়ার জন্য টনটন করছে। কিন্তু যে ডালটার উপর রেনস্‌ফর্ড শুয়েছিল ঠিক সেখানে পৌঁছবার পূর্বে শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেমে গেল। তার রোদে পোড়া মুখে দেখা দিল স্মিত হাস্য। যেন অতিশয় সুচিন্তিতভাবে তিনি ধুঁয়োর একটি রিং উপরের দিকে উড়িয়ে দিলেন; তারপর গাছটার দিকে পিছন ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন। ঘাস পাতার উপর তাঁর শিকারের বুটের খস্‌খস্ শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো।

ফুসফুসের ভিতরে রেন্‌স্‌ফর্ডের বন্ধ প্রশ্বাস উষ্ম বিস্ফোরণের মত ফেটে বেরুলো। তার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হল সেটা

তাকে ক্লিষ্ট, অবশ করে দিল। শিকার যেটুকু সামান্যতম চিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য হয় জেনারেল সেই খেই ধরে রাতের অন্ধকারে বনের ভিতর এগুতে জানেন; তিনি ভূতুড়ে শক্তি ধরেন। সামান্যতম দৈববশে কসাক তাঁর শিকার এবার দেখতে অক্ষম হয়েছেন।

রেন্‌স্‌ফর্ডের দ্বিতীয় চিন্তা বীভৎসতর রূপে উদয় হল। সে কুচিন্তা তার সর্বসত্তার ভিতর মরণের হিমের কাঁপন তুলে দিল। জেনারেল মৃদু হাস্য করলেন কেন? তিনি ফিরে চলে গেলেন কেন?

তার সুস্থ বিচার-বুদ্ধি তাকে যে কথা বলছিল রেন্‌স্‌ফর্ড সে-সত্য বিশ্বাস করতে চাইল না--অথচ ঠিক সেই সময় প্রভাত সূর্য যেরকম কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল সে সত্য ঠিক ঐ রকমই প্রত্যক্ষ। জেনারেল তাঁর সঙ্গে শিকার খেলা খেলছেন! আরেক দিনের শিকার খেলার জন্য জেনারেল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছেন! কসাকই বেরাল; সে ইঁদুর। মৃত্যুর আতঙ্ক তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে এই প্রথম রেন্‌স্‌ফর্ডের কাছে আত্মপ্রকাশ করলো।

'আমি আত্মকর্তৃত্ব হারাবো না, কিছুতেই না।'

সে গাছ থেকে পিছলে নেমে আবার ঘন বনের ভিতর ঢুকলো। তার মুখ তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন এবং সে তার মস্তিষ্কযন্ত্র সবলে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়ে দিল। প্রায় তিন শ গজ দূরে সে বিরাট একটা মরাগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়াল। সেটা বিপজ্জনক ভাবে পড়ো-পড়ো হয়ে একটা ছোট জ্যান্ত গাছের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার খাবারের ব্যাগ মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে শিকারের ছোরা বের করে পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কর্ম সমাপ্ত হল। শ'ফুট খানেক দূরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেরালটা ঐ তো আবার আসছে, ইঁদুরের সঙ্গে খেলবে বলে!

ডালকুত্তার মত দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে জেনারেল জারফ আসছেন রেন্‌স্‌ফর্ডের খেই ধরে ধরে। তাঁর সদাসন্ধানী কালো চোখকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না—একটি মাত্র থেৎলে যাওয়া ঘাসের পাতা না, বেঁকে যাওয়া ছোট্ট ডালের টুকরোটি না, শ্যাওলার উপর ক্ষীণতম চিহ্নটি না—হোক না সে যতই ক্ষীণ। সন্ধান খুঁজে খুঁজে এগুতে গিয়ে জেনারেল এতই নিমগ্ন ছিলেন যে রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর জন্য যে জিনিসটি তৈরী করেছিল সেটা না দেখার পূর্বেই তার উপরে এসে পড়লেন। তাঁর পা পড়লো সামনে-এগিয়ে-পড়া একটা ঝোপের উপর—এইটেই রেন্‌স্‌ফর্ডের পাতা ফাঁদের হ্যাণ্ডিল। কিন্তু তাঁর পা ঐটে ছোঁয়া মাত্রই জেনারেলের চৈতন্যে বিপদের পূর্বাভাস চমক মারলো—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র বানরের মত তিনি তড়িৎ বেগে পিছনের দিকে লাফ দিলেন। কিন্তু যতখানি ক্ষিপ্র হওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক ততখানি হন নি; কাটা জ্যান্ত গাছের উপর সন্তর্পণে রাখা মরা গাছটা মড়মড়িয়ে পড়ার সময় জেনারেলের ঘাড়ের উপর মারলো ট্যারচা ঘা। জেনারেলের ক্ষিপ্র বিদ্যুৎগতি না থাকলে তিনি গাছের তলায় নিঃসন্দেহে গুঁড়িয়ে যেতেন। টাল খেয়ে তিনি টলতে লাগলেন বটে কিন্তু মাটিতে পড়লেন না; এবং পিস্তলটিও হস্তচ্যুত হল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জখমী ঘাড়টাতে হাত ঘষতে লাগলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকটাকে সেই ভীতি আবার পাকড়ে ধরেছে; সে শুনতে পেল জেনারেলের ব্যঙ্গ-হাস্য জঙ্গলের ভিতর খলখলিয়ে উঠছে।

তিনি যেন ডেকে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড, আপনি যদি আমার কণ্ঠস্বরের পাল্লার ভিতরে থাকেন—এবং আমার বিশ্বাস আছেন, তবে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই। মালয় দেশের মানুষ ধরার ফাঁদ খুব বেশী লোক বানাতে জানে না। কিন্তু আমার কপাল ভালো যে আমিও মালাক্কাতে শিকার করেছি। আপনি

সত্যি এখন আমার কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছেন। আমি এখন আমার জখমটাকে পট্টি বাঁধতে চললুম ; জখমটা সামান্যই। কিন্তু আমি ফিরে আসছি। আমি ফিরে আসছি।'

জেনারেল যখন তাঁর ছড়ে-যাওয়া ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গেলেন তখন রেন্‌স্‌ফর্ড আবার আরম্ভ করলো তার পলায়ন। এবারে সত্যকার পলায়ন—আশাহীন, জীবনমরণের পলায়ন, এবং সে পলায়ন চললো কয়েক ঘণ্টা ধরে। গোধূলির আলো নেমে এল, তার পর অন্ধকার হল, তবু তার অগ্রগতি বন্ধ হল না। পায়ের নিচের মাটি তখন নরম হতে আরম্ভ করেছে, গুল্মলতা ঘনতর নিবিড়তর হতে লাগলো, পোকাগুলোও ভীষণভাবে তাকে কামড়াতে আরম্ভ করেছে। তার পর আরেকটু এগুতেই তার পা জলা মাটিতে ঢুকে বসে গেল। সে তার পা-টা মুচড়ে টেনে বের করবার চেষ্টা করলো কিন্তু সেই চোরা-কাদা বিরাট জোঁকের মত তার পা পাশবিক শক্তির সঙ্গে শুষতে লাগলো। প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগ করে রেন্‌স্‌ফর্ড তার পা-খানা মুক্ত করলো। সে তখন বুঝতে পেরেছে, কোথায় এসে পৌঁচেছে। এ সেই 'মরণ-জলা' তার চোরাবালি নিয়ে।

তার হাত দুটি তখন মুষ্টিবদ্ধ। যেন তার বিচারবুদ্ধির সুস্থ স্নায়ুবল ধরাছোঁয়ার জিনিস এবং সেইটাকে অন্ধকারে কে যেন তার কব্জা থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ থলথলে মাটি তার মনে এক নূতন কৌশল এনে দিল। চোরাবালি থেকে ডজনখানেক ফুট পিছিয়ে গিয়ে যেন কোনো আদিম অন্ধকার যুগের মৃত্তিকা খননদক্ষ বিরাট বীভারের মত সে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

ফ্রান্সে যুদ্ধের সময় মাটি খুঁড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড ট্রেঞ্চের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে—তখন এক সেকেণ্ডের বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল মৃত্যু। তখনকার মৃত্তিকাখনন এর তুলনায় তার কাছে গদাইলস্করী

চালের খেলাধুলো বলে মনে হল। গর্তটা গভীর হতে গভীরতর হতে লাগলো ; যখন সেটা তার ঘাড়ের চেয়েও গভীর হল তখন সেটার থেকে বেয়ে উঠে কতকগুলো শক্ত গাছের চারা কেটে ডগাগুলো সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ করে বানালো বর্শার মত করে। ডগাগুলো উপর মুখো করে সেগুলো সে পুঁতে দিল গর্তের তলাতে। আগাছা আর ছোট ছোট ডাল নিয়ে দ্রুত হস্তে একটা এবড়ো-খেবড়ো কার্পেটের মত করে বুনলো এবং সেটা গর্তের উপর পেতে মুখটা বন্ধ করে দিল। ঘামে জবজবে ভেজা ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর নিয়ে সে গুঁড়ি মেরে বসলো একটা বাজে পোড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে।

সে বুঝতে পেরেছে তার তাড়নাকারী আসছে ; নরম মাটির উপর পায়ের থপ থপ শব্দ সে শুনতে পেয়েছে এবং রাত্রের মৃদু বাতাস জেনারেলের সিগারেট-সৌরভ তার কাছে নিয়ে এসেছে। তার মনে হল যেন জেনারেল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন ; আগের মত এক ফুট এক ফুট করে সমঝে-বুঝে আসছেন না। যেখানে গুঁড়ি মেরে রেন্‌স্‌ফর্ড বসে ছিল সেখান থেকে সে জেনারেল বা গর্তটা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। প্রত্যেকটি মিনিট যেন তার কাছে এক একটা বছরের আয়ুষ্কাল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তার পর হঠাৎ সে উল্লাস ভরে সানন্দে চিৎকার করতে যাচ্ছিল—কারণ সে শুনতে পেয়েছে মড়মড় করে গর্তের ঢাকনা ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছে ; ধারালো কাঠের ডগাতে পড়ে কে যেন বেদনার তীক্ষ্ণ আর্তরব ছেড়েছে। তার লুকানো জায়গা থেকে সে লাফ দিয়ে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মুষড়ে গিয়ে পিছু হটলো। গর্ত থেকে তিনফুট দূরে একজন মানুষ ইলেক্‌ট্রিক টর্চ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেনারেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ‘শাবাশ রেন্‌স্‌ফর্ড, তোমার

বর্মা-পদ্ধতিতে তৈরী গর্তটা আমার সবচেয়ে সেরা কুকুরদের একটাকে গ্রাস করেছে। আবার তুমি জিতলে। এবারে দেখবো মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, তুমি আমার পুরো পাল কুকুরের বিরুদ্ধে কি করতে পার। আমি এখন বাড়ি চললুম একটু বিশ্রাম করতে। ভারি আমোদে কাটলো সন্ধ্যাটা—তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জলাভূমির কাছে শুয়ে রাত কাটানোর পর ভোর বেলা তার ঘুম ভাঙল এমন একটা শব্দ শুনে যেটা তাকে বুঝিয়ে দিল যে ভয় বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে এখনো তার নূতন-কিছু শেখবার আছে। শব্দটা আসছিল দূর থেকে—ক্ষীণ, এবং ভাসা ভাসা। এক পাল কুকুরের চিৎকার।

রেন্‌স্‌ফর্ড জানতো, সে দুটোর একটা করতে পারে। যেখানে আছে সেখানেই থেকে অপেক্ষা করা। সেটা আত্মহত্যার সামিল। কিংবা সে ছুট লাগাতে পারে। সেটা হবে অবধারিতকে মুলতুবি করা। এক মুহূর্তের তরে সে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো। তার মাথায় যা এল সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ। কোমরের বেল্ট শক্ত করে নিয়ে সে জলাভূমি ত্যাগ করলো।

কুকুরগুলোর চিৎকার আরো কাছে আসছে, তারপর আরো কাছে, তার চেয়েও আরো কাছে। পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপরে একটা গাছে চড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড দেখতে পেল, একটি জলধারার পোয়াটাক মাইল দূরে একটা ঝোপ নড়ছে। চোখ যতদূর সম্ভব পারে টাটিয়ে দেখতে পেল জেনারেলের একহারা শরীর আর তার সামনে আরেকজনের বিশাল স্কন্ধ জঙ্গলের উঁচু বোনো ঘাস ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে। এ সেই নরদানব ইভান। তাকে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; রেন্‌স্‌ফর্ডের বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না সে কুকুরগুলোর চেন হাতে ধরে রেখেছে।

যে কোনো মুহূর্তে তারা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। তার মগজ

তখন ক্ষিপ্তবেগে চিন্তা করছে। ইউগাণ্ডায় শেখা গ্রামবাসীদের একটা ফন্দি তার মনে এল। গাছ থেকে নেমে সে একটা লিকলিকে চারাগাছের সঙ্গে তার শিকারের ছোরাটার ডগা নিচের দিকে মুখ করে বাঁধলে সে যে-পথ দিয়ে এসেছে তার ঠিক উপরে; সর্বশেষে চারাগাছটাকে লতা দিয়ে ধনুর মত বাঁকিয়ে পিছন দিকে বাঁধলো। তার পর সে দিল প্রাণপণ ছুট। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে আবার তার গন্ধ পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে তীব্রতর স্বরে। এইবারে রেন্‌স্‌ফর্ড হৃদয়ঙ্গম করলো, কোণ-ঠাসা শিকারের বুকে কোন্ অনুভূতি জাগে।

দম নেবার জন্য তাকে থামতে হল। হঠাৎ কুকুরগুলোর চিৎকার থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেন্‌স্‌ফর্ডের হৃদ্‌স্পন্দনও যেন থেমে গেল। তাহলে তারা নিশ্চয়ই ছোরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড উত্তেজনার চোটে চড়চড় করে একটা গাছে উঠে পিছন পানে তাকালো। তার তাড়নাকারীরা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু গাছে চড়ার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড তার হৃদয়ে যে আশা পুষেছিল সেটা লোপ পেল; সে দেখতে পেল শুকনো উপত্যকার উপর জেনারেল জারফ আপন পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ইভান নয়। জ্যা মুক্ত চারাগাছের আঘাতে ছোরাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফলকাম হয় নি।

রেন্‌স্‌ফর্ড হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে না পড়তে কুকুরগুলো আবার চিৎকার করে উঠলো।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলছে, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, হবে, হবে।' একদম সামনে, গাছগুলোর ফাঁকে দেখা দিয়েছে এক ফালি নীলরঙের ফাঁকা। রেন্‌স্‌ফর্ড প্রাণপণ ছুটলো সেদিক পানে। পৌঁছল সেখানে। সেটা সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র সেখানে খানিকটে ঢুকে গিয়ে ছোট্ট উপসাগরের মত আকার ধরেছে। রেন্‌স্‌ফর্ড তারই ওপারে দেখতে পেলো বিষণ্ণ পাঁশুটে পাথরের তৈরী জেনারেলের শাটো। রেন্‌স্‌ফর্ডের পায়ের

বিশফুট নিচে সমুদ্র গজরাচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। রেন্‌স্‌-ফর্ড দোটানায়। শুনতে পেল কুকুরগুলোর চিৎকার। লাফ দিয়ে পড়ল দূরে, সমুদ্রে।

জেনারেল আর তাঁর কুকুরের পাল সে জায়গায় পৌঁছলে পর তিনি সেখানে থামলেন। কয়েক মিনিটের তরে তিনি তাকিয়ে রইলেন নীলসবুজ বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে। ঘাড়ের ঝাঁকুনি দিয়ে 'যাকগে' ভাব প্রকাশ করলেন। তার পর মাটিতে বসে রূপোর ফ্লাস্ক থেকে ব্র্যাণ্ডি খেয়ে সুগন্ধি সিগারেট ধরিয়ে 'মাদাম বাটারফ্লাই' গীতিনাট্য থেকে খানিকটা গান গুনগুন করে গাইলেন।

সে রাত্রে তাঁর কাঠের আস্তরওলা বিরাট ডাইনিং হলে জেনারেল জারফ অত্যুৎকৃষ্ট ডিনার খেলেন। সঙ্গে পান করলেন এক বোতল পল রজের আর আধ বোতল শাঁবেরত্যাঁ। দুটি যৎসামান্য বিরক্তিকর ঘটনা তাকে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগে বাধা দিল মাত্র। তার একটা, ইভানের স্থলে অন্য লোক পাওয়া কঠিন হবে এবং অন্যটা, তার শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে—স্পষ্টই দেখা গেল যে মার্কিনটা আইন মাফিক শিকারের খেলাটা খেলল না ডিনারের পর লিক্যোরে চুমুক দিতে দিতে অন্তত জেনারেলের তাই মনে হল। আরাম পাবার জন্য তাই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে মার্কুস্‌ আউরেলিয়ুসের রচনা পড়লেন। দশটার সময় তিনি শোবার ঘরে ঢুকলেন। দোরে চাবি দিতে দিতে তিনি আপন মনে বললেন, আজকের ক্লান্তিটা তাঁর বড় আরামের ক্লান্তি। সামান্য একটু চাঁদের আলো আসছিল বলে তিনি বাতি সুইচ্‌ করার পূর্বে জানলার কাছে গিয়ে নিচে আঙিনার দিকে তাকালেন। বিরাট কুত্তাগুলোকে দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসছে বারে তোমাদের কপাল ভালো হবে, আশা করছি।' তার পর তিনি আলো সুইচ্‌ করলেন।

খাটের পর্দার আড়ালে যে লোকটা লুকিয়ে ছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

জেনারেল চেঁচিয়ে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড! ভগবানের দোহাই, তুমি এখানে এলে কি করে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'সাঁতরে। আমি দেখলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না এসে এ ভাবেই তাড়াতাড়ি হয়।'

জেনারেল ঢোক গিললেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি শিকারে জিতেছেন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিতহাস্য হাসলো না। নিচু স্বরে হিসহিসিয়ে সে বললে, 'আমি এখনো কোণে-ঠাসা শিকারের পশু। তৈরী হোন, জেনারেল জারফ!'

জেনারেল যে ভাবে নিচু হয়ে বাও করলেন সেটা তাঁর গভীরতম বাওয়ের একটি। বললেন, 'তাই নাকি? চমৎকার! আমাদের এক জনকে কুত্তাগুলোর খানা হতে হবে। অন্য জন ঘুমুবে এই অতি উৎকৃষ্ট শয্যায়। এসো রেন্‌স্‌ফর্ড হুঁশিয়ার…'

রেন্‌স্‌ফর্ড সিদ্ধান্ত করলো, এর চেয়ে ভাল বিছানায় সে কখনো ঘুমোয় নি॥

অপর্ণার পারণা বা স্যালাড

বাসনা ছিল দু-একটি গাল-গল্প বলার পর যখন আসর খানিকটে গুম পেয়েছে তখন এই লেখাটিতে হাত দেব কিন্তু হিসেব করে দেখি সে আর হয় না। স্যালাড পাতা বাজারে ফুরিয়ে যাওয়ার পর এ লেখা বেরলে কে আর সেটি ন'মাস বাঁচিয়ে রাখবে? এমন কি মনে হচ্ছে এমনিতেই বোধহয় কিঞ্চিৎ দেরী হয়ে গেল। অবশ্য কলকাতা এবং হিলস্টেশনে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা আলাদা।

স্যালাড শব্দের মূল অর্থ 'নোনতা' কিন্তু এখন শব্দটি অন্য নানা অর্থে ব্যবহার হয়। প্রধানত কাঁচা পাতা খাওয়ার অর্থে। তাই আমি যখন কোনো ইয়োরোপীয়কে পান দি, তখন বলি, 'হ্যাভ্ সাম নেটিভ স্যালাড!'—অবশ্য তারা পান বলতে সেটাকে স্যালাডের ভিতর ধরে না।

স্যালাড বললে দেশে-বিদেশে প্রধানত লেটিস (ইংরেজিতে বানান lettuce কিন্তু উচ্চারণ লেটিস) স্যালাডই বোঝায়। তার নানা জাত-বর্ণ আছে কিন্তু এদেশে প্রধানত হেড্ এবং লীফ্ এই ধরনেরই রেওয়াজ বেশী। হেড অর্থাৎ মাথা—এ লেটিস দেখতে অনেকটা বাঁধা কপির মত। আর লীফ স্যালাডে থাকে শুধু পাতা। দুটোরই বাইরের দিকের পাতাগুলো পুরু এবং তেতো বলে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের নরম-বস্তু কাজে লাগাতে হয়। আর যদি আপন বাগানে লীফ ফলিয়ে থাকেন তবে সূর্য ওঠবার সময়—আগে হলে আরো ভাল—প্রয়োজন মত যে কটি পাতা দরকার সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন লেটিসের ভিতরকার দিক থেকে ছিঁড়ে তুলে নেবেন (ভিন্ন ভিন্ন লেটিসে সে-সব জায়গায় আবার নূতন কচি পাতা গজাবে, বাইরের দিকে যে পাতাগুলো ছেঁড়েন নি সেগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে)। কেউ কেউ বলেন স্যালাড তৈরী করা পর্যন্ত পাতাগুলো ভিজিয়ে রাখতে, আমি বলি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখতে।

অমলেট, মাছভাজা যেমন বেশী আগে তৈরী করে রাখা হয় না, স্যালাডও তেমনি খেতে বসার যত অল্পক্ষণ আগে করা যায় ততই ভালো ; না হলে পাতাগুলো নেতিয়ে একাকার হয়ে যায়।

সবচেয়ে ঘরোয়া আটপৌরে স্যালাড কি করে বানাতে হয় তারই বর্ণনা দিচ্ছি। এটা বানাতে যে-সব মাল-মসলা লাগে সেগুলো আপনার ভাঁড়ারে আর সব্জীর ঝুড়িতেই আছে—আপনাকে শুধু কিছু লেটিস পাতা কিনে আনতে হবে। আপনার যদি স্যালাড সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞানগম্যি থাকে তবে আপনি এখানেই তীব্র কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'কিন্তু অলিভ ওয়েল ?—সে তো আমাদের ভাঁড়ারে থাকে না!' দাঁড়ান বলছি, ওটা বড্ড আক্রা জিনিস—এমন কি খাজা ভেজালটাও কম আক্রা নয়। সে-কথা পরে আসছে।

বাজার কিংবা বাগান থেকে লেটিস পাতা এনে তার বাইরের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাইরের কটা পাতা যত বেশী ফেলবেন, ভেতরের কচি পাতার গুণে স্যালাড তত সুস্বাদু হবে, কিন্তু তা হলে তো পরিমাণ এত কমে যাবে যে খরচায় পোষাবে না। অতএব আপনাকেই চিন্তা করে স্থির করতে হবে, বাইরের কটা পাতা ফেলে দেবেন। এ ব্যাপারে পাকা গিন্নির মত বড্ড বেশী কঞ্জুসি করবেন না, কারণ লেটিস অতিশয় সস্তা জিনিস।

ভিতরের যে পাতাগুলো বাছাই করে নিলেন সেগুলো অতি সযত্নে ধুয়ে নেবেন। ধোয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ওগুলো থেকে ধুলো-বালি ছাড়ানো—আর কিছু নয়। তারপর পাতাগুলো হাত দিয়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে নেবেন, এই মনে করুন টুকরোগুলো যেন তিন ইঞ্চির মত লম্বা হয়। কিন্তু সাবধান! বঁটি দিয়ে কাটবেন না। যে-জিনিস কাঁচা খাওয়া হয় সেগুলো লোহা দিয়ে কাটা উচিত নয়—এ তো জানা কথা। স্টেনলেস স্টীলের ছুরি অবশ্য

ব্যবহার করতে পারেন—অথবা যাকে বলা হয় ফ্রুট নাইফ বা ফল কাটার ছুরি। কিংবা ঝিনুক, কিংবা বাঁশের ছিলকে দিয়ে। কাঁচা আম মা-মাসীরা যে পদ্ধতিতে কাটেন—বাঙলা কথা। কিন্তু লেটিসের পাতা ছিঁড়বেন হাত দিয়েই। এগুলো দরকার হবে পরের জিনিসগুলো কাটবার জন্য।

এইবারে ছেঁড়া পাতাগুলো চিনে মাটির কিংবা শুধু মাটির চ্যাপ্টা থালাতে রাখুন। কাঁসা বা পেতল সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কারণ এতে নেবুর রস আসবে। সবচেয়ে ভালো হয়, ময়দা ছাঁকার ছাঁকনির উপর রাখলে। তাহলে পাতার গায়ের জল ঝরে পড়ে পাতাগুলো ফের শুকনো হয়ে যায়।

তার পর মোটা সাদা পেঁয়াজ চাকতি চাকতি করে কাটুন। টমাটো, শসাও চাকতি চাকতি করুন। ছোট ছোট নরম লাল মূলো কিংবা খুব নরম সাধারণ মূলোও চাকতি চাকতি করে দিতে পারেন। কাঁচা লঙ্কাও কুচি কুচি করে দেবেন, যদি বাড়ির লোক কাঁচালঙ্কার ঝাল পছন্দ করেন।

এইবারে সব-কিছু—অর্থাৎ লেটিসের ছেঁড়া পাতা ও এগুলো—একসঙ্গে রাখুন। তার উপর সরষের তেল ঢালুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরষের তেল, যে তেল দিয়ে আমরা তেল মুড়ি খাই। আপনি বলবেন, 'অলিভ তেলের কি হল?' উত্তরে নিবেদন, স্যালাড বানাবার সময় মার্কিন-ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ফরাসীরা মাস্টার্ড পাউডার অর্থাৎ সর্ষেগুঁড়ো অলিভওয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, কিংবা আগে ভাগে সর্ষেগুঁড়ো জলের সঙ্গে খুব পাতলা করে মিশিয়ে তার সঙ্গে লেটিস পাতা মাখিয়ে নেয়। অলিভওয়েলের আপন গন্ধ ও স্বাদ খুব কম। তার সঙ্গে সর্ষেগুঁড়ো মেশালে ফলে তো সর্ষের তেলই দাঁড়ালো—অবশ্য আমাদের সর্ষের তেলের ঝাঁজ এবং ধক তাতে থাকবে না। অবাঙালী সর্ষের তেলের ঝাঁজ সইতে পারে

না বলেই 'অলিভওয়েল অলিভওয়েল' করে। আমরা যখন ঐটেই পছন্দ করি তবে সর্ষে তেল দিয়ে স্যালাড বানাবো না কেন? আমি নিজে তো পুরনো আচারের মজা সর্ষের তেলই ব্যবহার করি।

সর্ষের তেলে সব কিছু আলতো আলতো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর তার উপরে ঢালবেন পাতি বা কাগজী নেবুর রস। নূন। সব কিছু ফের আলতো আলতো করে মাখুন। ব্যস্—স্যালাড তৈরী।

নেবুর রসের বদলে অনেকেই ভিনিগার বা সিরকা দেয়। তার কারণ ইয়োরোপে ঐ ভিনিগার ছাড়া অন্য কোনো টক বস্তু নেই। নেবুর রসের বদলে যদি ভিনিগার ব্যবহার করেন তবে সেটা জল দিয়ে ডাইলুট অর্থাৎ কম-জোর বা কম-তেজ করে নেবেন।

প্রশ্নটা, কতখানি লেটিসের সঙ্গে কতখানি পেঁয়াজ টমাটো, শসা, তেল, নেবুর রস দেব? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মনে রাখা উচিত, লেটিস পাতাই হবে প্রধান জিনিস, সেই যেন বাকি সব জিনিসের উপর প্রাধান্য করে। পাতাগুলো তেলতেলে হওয়ার মত তেলে মাখানো হবে, কিন্তু জবজবে যেন না নয়। নেবুর রস তেলের এক সিকি ভাগের মত। বেশী টকটক যেন মনে না হয়। এবং খাবার সময় স্যালাড পাতা যেন আর পাঁচটা জিনিসের চাপে আপন স্বাদ না হারায়।

এ স্যালাড অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে খেতে হয়। অর্থাৎ ডাল-ভাত, ভাত-ঝোল, ভাত-মাংস, এক গ্রাস মুখে দেবার পর খানিকটা স্যালাড মুখে নিয়ে একসঙ্গে চিবোবেন। স্বাধীন পদ হিসাবে যে স্যালাড খাওয়া হয় সেটাতে মাছ, মাংস কিংবা ডিম থাকে, এবং মায়োনেজ দিয়েই তৈরী করা হয়। (ডিমের হলদে ভাগের সঙ্গে তেল সিরকা দিয়ে মেখে মেখে সেটা তৈরী করতে হয়; বড্ড খুঁটিনাটি বলে বাজারে তৈরী মায়োনেজ বোতলে পাওয়া যায়, টমাটো সসেরই মত, যদিও ইটালিয়ানরা প্রতিদিন তাজা টমাটো সস বাড়িতেই বানায়, আমরা যে রকম বাজারের কারি পাউডার

না কিনে নিজেই হরেক জিনিস বেঁটেগুলে রান্নায় ব্যবহার করি।) সে-সব স্বাধীন পদের স্যালাড বানাতে এটা ওটা সেটা এবং সময়ও লাগে বেশী—তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা, বাঙালী রান্নার আর তিনটে পদের সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খায় না।

অনেকে আবার তেল-নেবুর রস ব্যবহার না করে লেটিসপাতা-টমাটো-প্যাঁজ সব-কিছু টক দইয়ে মেখে নেন, উপরে গোল মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। আমার তো ভালোই লাগে।

কাবুলীরা ব্যত্যয়। তারা শুধু লেটিস পাতা এক চোঙ্গা মধুতে গুত্তা মেরে খেয়ে চলে রাস্তায় যেতে যেতে।

আমাদের দেশে শীতকালেও রোদ কড়া বলে লেটিস ভালো হয় না। তাই এ-দেশে লেটিস ফলাতে জানেন অল্প লোকই। লেটিস ক্ষেত যেন দিনে অল্পক্ষণের জন্য পূবের রোদ পায়, সার যেন বেশী না দেওয়া হয়, এবং জল সেচের পরিমাণও নির্ণয় করা কঠিন। মোটকথা, লেটিস যেন বড্ড বেশী প্রাণবন্ত না হয়। তাকে যেন খানিকটে জীবন্মৃত রাখতে হয়। লেটিস পাতা পান ও তামাক পাতার মতই বড় ডেলিকেট নাজুক কোমল-প্রাণ। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বরজের মত কোনো একটা ব্যবস্থা করে লেটিস ফলিয়ে দেখলে হয়।

এখন সর্বশেষ প্রশ্ন, আমি স্যালাড নিয়ে অত পাঁচ কাহন লিখছি কেন?

প্রথম : স্যালাড জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। যে-কোনো ডাক্তারকে শুধোতে পারেন।

দ্বিতীয় : বাঙালী গরীব জাত। লেটিস সস্তা এবং স্যালাড বানাতে আর যে-সব জিনিস লাগে সেগুলো বাঙালীর ঘরে ঘরে কিছু-না-কিছু থাকে। প্রত্যেককে এক বাটি স্যালাড দিতে খর্চা তেমন কিছুই নয়। ডাল ভাত মাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রাস কিংবা দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রাসে কিছুটা স্যালাড খেলে ঐ দিয়ে পেটের

কিছুটা ভরে। একটা হাফ-পদও হল। পরে যদি স্যালাডে আপনার রুচি জন্মে যায় তবে আপনি তার পরিমাণ বাড়িয়ে পেটের আরো বেশী ভরাতে পারবেন।

তৃতীয়ত: স্যালাড এক্সপেরিমেণ্ট করে করে অনেক কিছু দিয়ে তার পরিমাণ বাড়ানো যায়। আলুসেদ্ধ চাকতি চাকতি করে (এমনকি আগের রাতের বাসি ঝোলের আলুগুলো তুলে নিয়ে, ধুয়ে, চাকতি চাকতি করে), মটরশুঁটি সেদ্ধ করে, গাজর বীট ইত্যাদি ইত্যাদি সব-কিছুই তাতে দেওয়া যায়। এমন কি ঠাণ্ডা হাফবয়েলড ডিমও চাকতি চাকতি করে দেওয়া যায়—তবে ওটা স্যালাড তৈরী হয়ে যাবার পর সর্বশেষে; নইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, অতি আলতো আলতো ভাবে মাখাবার সময়ও। অর্থাৎ বাড়ির কোনো কিছু খামকা বরবাদ হয় না। এমন কি আগের রাতের মাছ মাংস দিয়েও স্যালাড করা যায়—তবে সে অন্য মহাভারত, পদ্ধতি আলাদা।

সর্বশেষে পাঠক, এবং বিশেষ করে পাঠিকাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালাড এমন কিছু ভয়ঙ্কর সুখাদ্য নয় (দেখতেই পাচ্ছেন, যে-সব মাল দিয়ে স্যালাড তৈরী হয় সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক মূল্যবান সুখাদ্য নয়) যে আপনি হন্তদন্ত হয়ে স্যালাড তৈরী করে খেয়ে বলবেন, 'ও হরি! এই মালের জন্য আলী সায়েব এতখানি বকর বকর করলো।'

মনে পড়লো, এক মাহলাকে আমি কথায় কথায় এক বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সাবান ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। দিন সাতেক পরে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। নাক সিঁটকে বললেন, 'তা আর এমন কি সাবান!' আমি বললুম, 'ম্যাডাম, আপনি কি আশা করেছিলেন যে ঐ সাবান ব্যবহার করার সাত দিনের মধ্যেই আপনার কর্তা আপনাকে নূতন গয়না গড়িয়ে দেবেন!'—১৪ ক্যারেটের আগের কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার উপর দেশী বিদেশী কোন্ কোন্ মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে বাঙলাসাহিত্যে বহু বহু বৎসর ধরে আলোচনা গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে-একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি, সভাস্থলে সভাপতিরূপে, আপন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখছি। আমার মনের উপর সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছে, গুণীজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, আলোচনা। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটরেচারের) আঙ্গিকের (টেকনিকাল দিকের) আলোচনা করতে শুনি নি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব—লিরিকে কি গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয়, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কি প্রকারে? তিনি কোন্ পদ্ধতিতে এখানে এসে

পৌঁছলেন? কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত সে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পক্ষে নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে তিনি কি দেখলেন, কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গদ্য-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ঐ নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন। তার বোধহয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে বলে তাই নিয়ে আলোচনা করা সহজ; পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এমন কি সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ-গুণ এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কি পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় তাঁকে কোন্ কোন্ দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করতে শুনি নি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু বহুবার সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু, যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথা-সুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে শুনি নি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক

শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত—কিন্তু আমি এস্থলে যে বিষয়টির অবতারণা করেছি সেটি হত বলে জানি নে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনো প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য: চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে বিচরণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর (১৯০৫।৬) শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে একসঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখি নি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তী শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একদা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনো পা পিছলায় নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু-একটি কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরনের কোনো-কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনি নি।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল এ-কথা সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, উইনটারনিৎস, তুচ্চি, ফরমীকি, স্টেন-কোনো, মর্গেনস্টিয়ের্ণে, কলিন্‌স্‌ বগদানফ[১] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কখনো বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্যসভায়') কখনো স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলঙ্কার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী—বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ঐ নিয়ে তাঁর মুখের আলোচনা হত বেশী। অবশ্য এ-কথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশী। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেন নি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা—ধর্মদর্শন কাব্য অলঙ্কার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গেঃ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সে-কথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ঐ একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সে-জগতে বাস করলেও দেশের

১ এঁদের ছাড়া আরো বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। অন্যজন ভগবদ্‌ কৃপায় এখনো আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০।২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিস্তর শাস্ত্রালোচনা করেন।

গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয়—এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন বেদের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারারই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বিষয়টি আমার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন, কারণ এঁদের আলোচনা আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তীকালে, এবং আজও আমার সংহিতাজ্ঞান এতই যৎসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলাখেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ গবেষণা দ্বারা নয়। এস্থলে 'ত্রিধারা' 'ত্রিমূর্তি' বলার সময় আমি স্মরণে রেখেছি যে অনেকেই (যেমন 'ত্রিবেদী') চতুর্থ বেদ স্বীকার করেন না।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্ম তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিতজনোচিত বিশেষজ্ঞ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর জেন্দ-আবেস্তার ভাষা শেখেন।[২] ক্ষিতিমোহন

২ বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তা চর্চা আরম্ভ করেন।

গণধর্মের সন্ধানে হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষা-গুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন।

বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বপ্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতিমোহন যতখানি শ্রদ্ধাসহ, মনযোগ সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ-যুগে অন্য কোনো পণ্ডিতই করেন নি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয়, ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী, আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের বহু ব্রত এখানে পালিত হয়, এবং গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে পাবেন।

বিধুশেখরের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যা আহ্নিক পালন তথা সশ্রদ্ধ বেদাধ্যয়নের কথা নয়—বাহ্যিক শুচি অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ শুচিশুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য—অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মত।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মহাত্মা গাঁধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রম-বাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্রসাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখানকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গাঁধী সাবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শে আকণ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যারিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করছে, বিজলিই বা করবে না কেন?'

বিধুশেখর বললেন, 'রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হ্যারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই—বিজলির তুলনায়। বিজলি আনবে বিলাস। তার সর্বনাশের সর্বশেষ সোপান আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

পাঠক ক্ষণতরে ভাববেন না, বিধুশেখর সঙ্কীর্ণচেতা কূপমণ্ডুক ছিলেন। তাঁর প্রতি এর চেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে খৃষ্টান পাদ্রী এণ্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুগ্ধ কণ্ঠে 'যবন' ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্মলাভের পন্থা-বর্ণন করছেন, যিনি মৌলানা শওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম ভোজনাগারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যদি সঙ্কীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্বভারতবাসী যেন এ রকম

সঙ্কীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফর্ডে পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তমান প্রতীক। তাঁর সন্তুষ্টি থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হতে পারতেন। এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে—তা সে যত অল্পই হোক না কেন—আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যাবদ্ধ ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে, বর্তমান প্রাচীন সংসারের বিশ্বনাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাদর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল (ইস্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবাকেও গ্রহণ করতে হল। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গুণীজ্ঞানীরা একত্র হবেন', সঙ্গে সঙ্গে বিধুশেখর সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করে দিলেন, 'যত্র বিশ্ব ভবেত্যেকনীড়ম্।'

বিধুশেখরের আনন্দের সীমা নেই। এতদিন আশ্রম বালক তাঁর কাছ থেকে সন্ধি-সমাস পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পূর্বেই 'অর্ধ-স্নাতক' অবস্থায় আশ্রম ত্যাগ করতো, এখন ভারতের সর্ব খণ্ড থেকে আসতে লাগল প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী। এরা লুপ্তপ্রায় যাস্কের 'নিরুক্ত' অধ্যয়নে উদগ্রীব, বিধুশেখরেরই সম্পাদিত ও অনূদিত পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দা পঞ্হো' থেকে তাকে বহুতর 'পঞ্হো' (প্রশ্ন) শুধায়।

বিধুশেখরের আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে উপচে পড়ছে। এইবারে সত্য জ্ঞানচর্চা হবে। এইবারে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারবেন।

কিন্তু হায়, এই সব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই তো ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। এমন কি এদের ভিতর 'নাস্তিক' 'চার্বাকপন্থী'ও একাধিক ছিল। খৃষ্টান মুসলমানও ছিল। এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। খৃষ্টান ছেলেটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই 'চার্বাকপন্থী' তাকে বোঝালে খৃষ্টানের সর্বপ্রার্থনা যীশুর মারফৎ পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না ; এবং মুসলমানকে আল্লা রসূলের দোহাই দিলে। খৃষ্টান ধাঁধায় পড়লো, মুসলমান বললে, পাঁচ বেকৎকে সাত বেকৎ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু বেদমন্ত্রদ্বারা উপাসনা করছে এ-খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রী এণ্ড্রুজের হাতে।

এণ্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সার্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনলো। কিন্তু সংশয়বাদী তথা নাস্তিকদের মত-পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন—তিনি শুচি অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমন কি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেন নি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব, তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে-

ছিলেন ; আহারবিহার তিনি তাই আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল-বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা, তিনি সব ক'টিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ— এণ্ডুজ যে রকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মাঝখানে। তিনি এ যুগে সনাতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অসম্ভব' আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যান-লোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের, আশ্রমের পালপার্বণের জন্য মন্ত্রসন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তার উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়—ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে—অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। অদ্য বাব্দশতান্তে সে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী॥

রাষ্ট্রভাষা

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তাহলে সবদিক দিয়ে আমাদের যে কত সুবিধে হত সে-কথা ফলিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু যে কাজ-কারবারের মেলা বখেড়ার ফৈসালা হয়ে যেত তাই নয়, একই ভাষার ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে নবীন ভারতীয় সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের ইমারৎ গড়ে তুলতে পারতুম। মালমসলা আমাদের বিস্তর রয়েছে তাই সে ইমারৎ বাইরের পাঁচটা দেশের শাবাশীও পেত।

এ তত্ত্বটা নূতন নয়। কিন্তু একই ভাষার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ইমারৎ গড়ে তুলতে গেলেই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে করজোড়ে স্বীকার করছি আমার জীবনে আমি যত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী কাবু করেছে—এ দ্বন্দ্বের সমাধান আমি কিছুতেই করে উঠতে পারিনি। বিচক্ষণ পাঠক যদি দয়া করে এ-অধমকে সাহায্য করেন।

বৈদিক সভ্যতাসংস্কৃতি একটিমাত্র ভাষার উপরই খাড়া ছিল সে-কথা আমরা জানি তার কারণ সে যুগে আর্যরা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েননি এবং দ্বিতীয়তঃ অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি বলে সে ভাষাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন অতি অল্পই হয়েছিল।

প্রভু বুদ্ধের যুগ আসতে না আসতেই দেখি, সে-ভাষা আর আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারছে না। যতদূর জানা আছে, প্রভু বুদ্ধ তাঁর নবীন ধর্ম প্রচারের জন্য বৈদিক ভাষা কিংবা সে ভাষার তৎকালীন প্রচলিত রূপের শরণ নেননি। তিনি তৎকালীন সর্বজন-বোধ্য ভাষার শরণ নিয়েছিলেন—সে ভাষাকে প্রাকৃত বলা যেতে

পারে। ব্রহ্মণ্যধর্ম কিংবা ব্রহ্মণ্য ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি যে বিহারে প্রচলিত তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার শরণ নিয়েছিলেন তা নয়, কারণ সকলেই জানেন বুদ্ধদেব 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' এই সমাস বার বার ব্যবহার করেছেন, উভয়কে সমান সম্মান দেখাবার জন্য। জনপদ ভাষা যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের অন্যতর সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন এবং গণ-ভাষার প্রয়োগ ব্যতীত গণ-আন্দোলন সফল হতে পারে না।

এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় বিহারের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করাতে বুদ্ধদেব সর্বভারতের পণ্ডিতজনবোধ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ঠিক একই কারণে মহাবীর জিনও আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়ে অর্ধমাগধীতে আপন বাণী প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং জীবহত্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য বাদ দিলে বৌদ্ধ ও জৈন গণ-আন্দোলন একই রূপ একই গতি ধারণ করেছিল।

অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ভাষাও সংস্কৃত নয়।

তারপরের বড় আন্দোলন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আনয়ন করেন। তিনিও প্রধানত সর্বজনবোধ্য বাঙলার শরণ নিয়েছিলেন-- যদিও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান সে যুগের কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম ছিল না। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও তুকারাম মারাঠী ব্যবহার করেন। কবীর দাদু প্রভৃতি সাধকেরা হিন্দী ব্যবহার করেন। কবীর বললেন, "সংস্কৃত কূপজল" সে জল কূয়ো থেকে বের করে আনতে হলে ব্যাকরণ অলঙ্কারের লম্বা দড়ির প্রয়োজন কিন্তু "ভাষা" (অর্থাৎ সর্বজনবোধ্য প্রচলিত ভাষা) "বহত নীর" সে জল বয়ে যাচ্ছে, যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে শরীর শান্ত করা যায়। আর তুকারাম বললেন, "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তবে মারাঠী কি চোরের ভাষা ?"

তার পরের গণ-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন। তিনি

যদিও জনগণের ভাষা হিন্দীর শরণ নিয়েছিলেন তবু লক্ষ্য করার বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন বাংলা, তামিলনাড়, অন্ধ্র কেরালায় হিন্দী কিংবা ইংরিজির মাধ্যমে আপামর জনসাধারণে প্রসার লাভ করেনি; জনগণ যে সাড়া দিল সে বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ভাষার মাধ্যমে—অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করার ফলে। বারদলই সত্যাগ্রহের প্রধান বক্তা ছিলেন বল্লভভাই পটেল। তিনি যে অদ্ভুত তেজস্বিনী গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে ভাষা অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। বল্লভ-ভাইয়ের গুজরাতির সঙ্গে তাঁর হিন্দীর কোনো তুলনাই হয় না।

এতক্ষণ ধরে যে ঐতিহ্যের বর্ণনা দিলুম সে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রভু খৃষ্ট সাধু এবং পণ্ডিতী ভাষা হীব্রুতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ জেলে। তাঁর প্রচার কার্য এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয় বলে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন গ্যালিলি-নাজারেৎ অঞ্চলবোধ্য আরামেইক উপভাষায়। মহাপুরুষ মহম্মদও যখন আরবীর মাধ্যমে আল্লার আদেশ প্রচার করলেন তখন আরবী ভাষা ছিল পৌত্তলিকদের 'না-পাক' ভাষা, এবং সে ভাষায় ধর্ম প্রচারের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে মহাপুরুষ মুহম্মদের ঈষৎ পূর্বে এবং তাঁর সমবর্তীকালে মক্কাবাসীদের যাঁরা সত্য পথের অনুসন্ধান করতেন তাঁরা হীব্রু শিখে সে ভাষার ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। তাই যখন মহাপুরুষ হীব্রুর শরণাপন্ন না হয়ে আরবীর মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করলেন তখন সবাই তাজ্জব মেনে গেল। তার উত্তরে আল্লাই কুরান শরীফে বলেছেন, তাঁর প্রেরিত পুরুষ যদি আরব হয় তবে প্রচারের ভাষা আরবী হবে না তো কি হবে? আর আরবী না হলে সবাই বলত "আমরা তো এসব বুঝতে পারছিনে।"

লুথারও পোপের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন জর্মনের পক্ষ নিয়ে—পণ্ডিতী লাতিন তিনি এই বলেই অস্বীকার করেছিলেন যে সে-ভাষার সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

মোদ্দা কথা এই, এ-পৃথিবীতে যত সব বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—তা সে নিছক ধর্মান্দোলনই হোক আর ধর্মের মুখোস পরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনই হোক—তার সব কটাই গণ-আন্দোলন, এবং গণ-আন্দোলন সর্বদাই আঞ্চলিক গণভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।*

॥ ২ ॥

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আছে সে সত্য তর্কাতীত, কিন্তু প্রশ্ন সে-ভাষা গণ-আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি না? যাঁরা মনে করেন, স্বরাজ লাভ হয়ে গিয়েছে এখন আর গণ-আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁরা হয় মারাত্মক ভুল করছেন নয় ভাবছেন দেশের জনগণ তাঁদের জন্য পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খাটবে আর তাঁরা শহরে শহরে দিব্য খাবেন দাবেন আর কেউ কোনো প্রকারের তেরীমেরী করলে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখাবেন এবং তাইতেই সব কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

সেটি হচ্ছে না, সেটি হবার জো নেই। যে জনসাধারণকে একদা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে স্বরাজের জন্য লড়ানো হল তাদের এখন ডেকে আনতে হবে রাষ্ট্রনির্মাণ কর্মে। তারা যদি ভারতীয় রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র বলে চিনতে না পারে, সে রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের আত্মীয়তাবোধ না জন্মে তবে নানাপ্রকারের বিপদের সম্মুখীন

---

* রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে বিপক্ষে যে ক'টি যুক্তি আছে, সব কটিরই আলোচনা করা এ প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য—লেখক।

হতে হবে—তার ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। পাড়ার কম্যুনিষ্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—সে সব বাৎলে দেবে।

এখন প্রশ্ন, কোন্ ভাষার মাধ্যমে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হব? বেশির ভাগ লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন পাঠশালাতে মাত্র একটি ভাষা শেখানো হবে—অর্থাৎ হিন্দী যে সব অঞ্চলের আপন ভাষা সেগুলো বাদ দিয়ে আর সর্বত্র মাত্র প্রাদেশিক ভাষাটিই শেখানো হবে। অর্থাৎ বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র অঞ্চলের পাঠশালা-গুলোতে ছেলেমেয়েরা শুদ্ধ আপন আপন মাতৃভাষা শিখবে। ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা কবে দূর হবে জানিনে, তবে আশা করি সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিরক্ষরতা দূর হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্ত এ দেশের শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করবে—এবং শিখবে শুধু মাতৃভাষা।

বাদবাকীরা হিন্দী শিখবেন—সে হিন্দী জ্ঞান কতটা হবে তার আলোচনা পরে হবে—এবং ক্রমে ক্রমে অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরিজি শিখবেন, আজকের দিনে চীন কিংবা মিশরের লোক যে অনুপাতে ইংরিজি শেখে।

রাষ্ট্রভাষা সর্বভারতে চালু করনেওয়ালারা বলেন, আজ ইংরিজি ভাষা যে রকম ব্যবহৃত হচ্ছে একদিন হিন্দী তার আসনটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ যাবতীয় রাজকার্য, মামলা-মোকদ্দমার তর্কাতর্কি, রায়, আপিল, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হিন্দীতে হবে। কলকাতা তথা অন্ধ্র, তামিলনাড় বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে জ্ঞানদান হবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ধোকা রয়ে গিয়েছে তবে কট্টর রাষ্ট্রভাষীদের বাসনা যে তাই সে সম্বন্ধে খুব বেশি সন্দেহ নেই।

তাহলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি ইংরেজ আমলে যে রকম আমাদের বেশীর ভাগ ভালো লেখকেরা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে

ইংরিজিতে বই লিখতেন (রাধাকৃষ্ণনের ইণ্ডিয়ান ফিলসফি থেকে পণ্ডিতজীর ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া ইস্তেক) ঠিক তেমনি আমাদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন হিন্দীর মাধ্যমে এবং যে সৎসাহিত্য—গল্প উপন্যাস কবিতাই সাহিত্যের একমাত্র কিংবা প্রধান সৃষ্টি নয়—হিন্দীতে গড়ে উঠবে সেটা, বাঙলা, তামিল, গুজরাতি সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার খেসারতি দিয়ে। এতদিন যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে নানামুখী সৃষ্টিকার্য প্রসার এবং প্রচার লাভ করতে পারছিল না তার জন্য আমরা প্রাণভরে ইংরিজির জগদ্দল পাথরকে গালমন্দ করেছি এখন হিন্দীর চাপে সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়ত গালমন্দ করার অধিকার থাকবে না। পূর্ব-বঙ্গে যখন উর্দূকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল তখন আমি অন্যান্য যুক্তির ভিতর এইটিও পেশ করে তীব্রকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিলুম এবং বহু পূর্ববঙ্গবাসী আমার যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হবে সে কথা এখন থাক। উপস্থিত মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, ভারতীয় নবীন রাষ্ট্রনির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যেসব গ্রাম্‌ভারী কেতাব, ব্লু বুক, দলিল-দস্তাবেজ, উৎসাহোদ্দীপক ওজস্বিনী এবং গম্ভীর পুস্তক রচিত হবে সেগুলো হবে হিন্দীতে এবং দেশের শতকরা সত্তরজন লোক গ্রামে বসে সেগুলো পড়তে পারবে না।

একদা এই সত্তরজন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র এই সত্তরজনকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাবৎ কেতাব বাঙলাতে লিখলেই কি এরা সেগুলো পড়ে বুঝতে পারবে? সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। আমার বিশ্বাস দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় সব সময় বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের দেওয়া ছাপের উপর নির্ভর করে না। এমন সব ইংরাজ-অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধ বাঙলা-ভাষী পাঠশালার পণ্ডিত আছেন, যাঁরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলে এবং বাঙলা দৈনিকের মারফতে অতি অল্প যে রাষ্ট্রসংবাদ পান তারই জোরে গ্রাজুয়েটকে তর্কে ঘায়েল করতে পারেন। অনেক এম. এ. পাস লোক বই জমায় না —জমালে জমায় চেক বুক—আর অনেক পাঠশালার পণ্ডিত গোগ্রাসে যে কেতাব পান তাই গেলেন। পুনরায় নিবেদন করি, জ্ঞানতৃষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে না।

তাই দেখতে হবে আমাদের রাষ্ট্রনির্মাণ প্রচেষ্টার সবসংবাদ যেন এমন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে ভাষা মানুষের মাতৃভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরিজি জাননেওয়ালা ও না-জাননেওয়ালার মধ্যে যে ন্যক্কারজনক কৌলীন্যের পার্থক্য ছিল সেটা যেন আমরা জেনে শুনে আবার প্রবর্তন না করি।

॥ ৩ ॥

সুশীল পাঠক, মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে এই যে আমি হপ্তার পর হপ্তা দাপাদাপি করছি তাতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ না তো? আমি তো হয়ে গিয়েছি কিন্তু বিষয়টি বড্ডই গুরুত্বব্যঞ্জক এবং আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের শুধু রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে না, আমাদের অতীত ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি সব কিছুই এর উপর নির্ভর করছে। একবার যদি ভুল রাস্তা ধরি তবে আমড়াতলার মোড়ে ফিরে আসতেই আমাদের লেগে যাবে বহু যুগ এবং তখন আবার নূতন করে সব কিছু ঢেলে সাজতে গিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আজকের দিনে পৃথিবীতে কেউ বসে নেই—তখন দেখতে পাবেন, আর সবাই এগিয়ে গিয়েছে,

অর্থাৎ রাজনীতিতে আপনি অমুক দেশের ধামাধরা হয়ে আছেন, অর্থনীতিতে আপনি আর এক মুল্লুকের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নিরেট হটেন্‌টট্ বনে গিয়েছেন!

কেন্দ্রের ভাষা যে হিন্দী হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাষা হবে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন, পার্লিমেণ্টে সদস্যেরা বক্তৃতা দেবেন কোন্ ভাষায়?

হিন্দীওলারা হিন্দীতে দেবেন—বাঙলা কথা। কিন্তু তামিল ভাষীরা দেবেন কোন্ ভাষায়?

এতদিন একদিক দিয়ে আমাদের কোন বিশেষ হাঙ্গামা ছিল না। সব প্রদেশের সদস্যরা ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতেন—অথচ কারোরই মাতৃভাষা ইংরিজি ছিল না বলে অহেতুক সুবিধা কেউই পেত না। এবং সে সুবিধাটা পেত ইংরেজ রাজসম্প্রদায় এবং তারা যে সে সুযোগটা ন'সিকে কাজে লাগত সেকথাও সবাই জানেন।

এখন অবস্থাটা হবে কি? কেঁদে-কুকিয়ে যেটুকু হিন্দী শিখব তার জোরে কি পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া যায়? পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিন্দীকে যদি তিরু অনন্তপুরম (ত্রিভান্দরম) কিংবা বিশাখপট্টনম (ভাইজাগ্) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করা হয় (কলকাতা কিছুতেই মানবে না, সে আপনি আমি বিলক্ষণ জানি) তবে তাদের আখেরটি ঝরঝরে হয়ে যাবে। অতএব অন্ধ্র, তামিলনাড়, কেরালার লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেটুকু হিন্দী শিখবে—(সবাই শিখবে তাও নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নাও শিখতে পারে)—তা দিয়ে কি সে হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ চালাতে পারবে?

দু'দণ্ড রসালাপ সব ভাষাতেই করা যায়। 'আমি তোমায় ভালবাসি,' 'জ্য ত্যেম্', 'ইষ লীবে ডীষ'—আহা, এসব কথা দেখতে না দেখতেই শিখে ফেলা যায়। মদন যেস্থলে গুরু, সখা কন্দর্পও হয়ত মজুদ, কালটি মধুমাস, উর্বশী দু চক্কর নাচভী দেখিয়ে দিচ্ছেন,

তার মধ্যিখানে সবাই এক লহমায় হরিনাথ দে হয়ে যান। কিংবা বলতে পারেন, সেখানে ভাষার দরকারই বা কি—কোন্ প্রয়োজন মধুর ভাষণ?

কিন্তু পার্লিমেন্টে তো মানুষ রসালাপ করতে যায় না। সেখানে লাগে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, চিন্তাধারা চিন্তাধারায় টক্কর লেগে 'উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,' বজেটকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে হয় যেখানে —সেখানে 'করেঙ্গা, খায়েঙ্গা' হিন্দী দিয়ে কাজ চলে না। আমাদের বাঙাল দেশে বলে 'ছাগল দিয়ে হাল চালাবার চেষ্টা করো না।'

বিচক্ষণ পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ঘড়েল প্যাসেঞ্জার কক্‌খনো, অর্থাৎ 'কাইট্যা ফালাইলে'ও বেহারী মুটের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক করার সময় হিন্দী বলে না। কারণ সে একখানা বলতে না বলতে মুটে ঝেড়ে দেবে পাঁচখানা পুরো পাঁচালী এবং লক্ষ্য করেছ, মুটেও ততোধিক ঘড়েল—দিব্য বাঙলা জানে, কিন্তু মেশিন গান চালাচ্ছে তার বিহারী হিন্দী 'করত, খাওত,' তার 'ভজলু কী বহিনিয়া ভগলু কী বেটিয়ার' ভাষা দিয়ে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখা ভাষা দিয়ে কোনো মরণ-বাঁচনের ব্যাপারে তর্কাতর্কি করা যায় না। সে ভাষা দিয়ে বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়—ব্যস্।

আরেকটা উদাহরণ দি। ইংলণ্ড যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করেছে ইংরেজ ছোকরাদের ফরাসী শেখাবার জন্য—দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। অথচ দশ হাজার ইংরেজ যদি প্যারিস বেড়াতে আসে তবে দশটা ইংরেজও ফরাসী বলতে পারে না।

সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। বাপ, মা, ম্যাট্রিক-পাস ব্যাটা নাবলেন ক্যালে বন্দরে। ইস্টিমারে ইংরিজি চলে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ক্যালেতেও হবে না, বাপ-মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ ছেলে ম্যাট্রিকে ফরাসীতে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। বাপ প্রতাপ রায়ের

মত ছেলে বরজলালকে হেসে বললেন, 'জিজ্ঞেস কর তো বাবাজী, পোর্টারটাকে—প্যারিসের ট্রেন কটায় ছাড়বে ?'

ছেলে প্রমাদ গুণছে। বরজলালেরই মত আপন ফরাসী ভাষার গুরুকে স্মরণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে যখন পোর্টারকে বিদঘুটে উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'আকেল আর পার লা ত্র্যাঁ পুর পারি?' তখন পোর্টার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে, হা করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর মিনিট তিনেক ঘাড় চুলকে চুলকে ভেবে নিলে। হঠাৎ মুখে হাসি ফুটল। চিৎকার করে আরেকটা পোর্টারকে ডাক দিয়ে বললে, 'এ, জ্যাঁ ভিয়ানিসি, ওয়ালা আঁ মসিয়ো কি পার্ল লাংলে।' 'এই জন, এদিকে আয়, এক ভদ্রলোক ইংরিজি বলছেন। বুঝতে নারনু।'

হায়, কিন্তু বেচারা ফাঁকি দিয়ে গোল্ড মেডেল মারেনি। ফরাসী ব্যাকরণ তার কণ্ঠস্থ, পাস্ট কণ্ডিশনাল, ফ্যুচার সবজনকটিভ তার নখাগ্র দর্পণে—কিন্তু ফরাসী জাতটাই নচ্ছার, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপন ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ শুনতে কিছুতেই রাজী হয় না!

* * *

কিন্তু পাঠক নিরাশ হবেন না। পার্লিমেণ্টে বক্তৃতার ভাষা সমস্যা সমাধান করা যায়। পরে নিবেদন করব।

॥ ৪ ॥

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি কি রূপ নেবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হলেই দেখতে পাই অনেকেই মনে মনে আশা পোষণ করছেন, সে বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলোকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব এবং এতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। যখন

ভাবি, এই ভারতবর্ষেই একদা একই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কাবুল থেকে কামরূপ, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী সর্ব-কলা প্রচেষ্টা সর্ব-জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, তখনই ঐক্যাভিলাষী হৃদয় উল্লসিত হয়ে ওঠে, আর তার পুনরাবৃত্তি দেখাতে চায়।

সংস্কৃতকে ব্যাপকভাবে পুনরায় সেরকমধারা চালু করার আশা আর কেউ করেন না। এখন প্রশ্ন, হিন্দীর মাধ্যমে সেটা সম্ভবপর কি না?

এই মনে করুন 'রামের সুমতি' কিংবা 'বিন্দুর ছেলে।' ধরে নিন অতি উত্তম অনুবাদক বই দুখানা হিন্দীতে অনুবাদ করলেন। আপনি উত্তম না হোক মধ্যম ধরনের হিন্দী জানেন, অর্থাৎ হিন্দী পুস্তক মাত্রই দিব্য গড় গড় করে পড়ে যেতে পারেন। এখন প্রশ্ন, আপনি কি সে সুখটা পাবেন যে সুখ ঐ দুখানা বাঙলা বই বাঙলাতে পড়ে পান? ('গোরা'র ইংরিজি তর্জমা পড়েছেন? তাতে তো কোনো সুখই পাওয়া যায় না—কারণ ইংরিজি অতি-দূরের ভাষা) কেন পান না? তার প্রধান কারণ বিন্দু কি ভাষায়, কি ভঙ্গিতে কথা বলে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পরিচয় আছে; যখন দেখবেন, তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না, সবই কৃত্রিম বোধ হচ্ছে, তখন আপনার কাব্য-রসাস্বাদনের সব বাসনা চিরতরে না হোক, তখনকার মত লোপ পাবে। সংস্কৃতে যাঁরা নাটক লিখে গিয়েছেন, তাঁরা এ তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতেন, তাই অন্ততঃ মেয়েদের দিয়ে সংস্কৃত বলান নি, বলিয়েছেন প্রাকৃত। নৃপ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বলেছেন, কারণ তাঁরা সংস্কৃত বলতে পারতেন, কিন্তু গোরা, বিনয়, আমিট রে কেউই দৈনন্দিন জীবনে হিন্দী বলেন না, কখনো বলবেন বলে মনে হয় না। কাজেই হিন্দী দিয়ে এদের চরিত্র বিকাশ করে বাঙালীকে সুখ দেওয়া যাবে না। যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, তাঁদের কথা আলাদা—তাঁরা অবশ্য অনেকখানি রস পাবেন—যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, অনুবাদ সাহিত্য

মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মত, মূল নক্সাটি বোঝা যায় মাত্র, আর সব রসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।*

উপরিস্থ তত্ত্ব-কথাটি সকলের কাছে এতই সুপরিচিত যে, আমার পুনরাবৃত্তিতে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন, কিন্তু এইটির উপর নির্ভর করে আমি যে বক্তব্য পেশ করবো ; সেটা যদি সকলে গ্রহণ করেন কিংবা অন্তত্তপক্ষে সেটি বিবেচনাধীন করেন, তবে আমি শ্রম সফল বলে মানব।

শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, অন্যান্য প্রচেষ্টাও স্বভাবতই প্রাদেশিকী রঙ নেয়। অজন্তা ও মোগল-শৈলীর নবজীবন লাভ হয় বাঙলাদেশে, তাই সে সম্বন্ধে যত আলোচনা গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই বাঙলাতে। অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাকে একবার সার্বভৌম অধিকার দিলে যে বৈদগ্ধ্য গড়ে উঠে, সেটা প্রাদেশিক।

এইখানে লেগে গেল দ্বন্দ্ব। আমরা এ প্রবন্ধ প্রারম্ভ করেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলিকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে মুক্তি কোন্ পন্থায়—প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতি জগতের চক্রবর্তীরূপে স্বীকার করে প্রাদেশিক সংস্কৃতি গড়ব, না বাংলা বর্জন করে হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করব?

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরো বিশ্বাস প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না।

কারণ ভারতীয় ঐক্য (ইউনিটি) ও ভারতীয় সমতা (ইউনিফরমিটি) এক বস্তু নয়। আজ যদি পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি

---

* সত্যই স্বামীজী বলেছেন কি না, হলপ করে বলতে পারব না ; এক গুণীর মুখে শোনা।

সবাই ভাত খেতে আরম্ভ করে, তবে বিদেশ থেকে শস্য কেনার সময় আমাদের বহুৎ বখেড়া আসান হয়ে যাবে, আজ যদি তাবৎ ভারতীয়ের উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হয়ে যায়, তবে সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানাবার কত না সুবিধা হয়! তবু কেউ বলবেন না, সবাইকে জোর করে ভাত খাওয়াও, কিংবা ঢ্যাঙাদের শরীর থেকে দু ইঞ্চ কেটে ফেলো। এ ইউনিটি নয়, ইউনিফর্‌মিটি।

যাঁরা মেরে-পিটে ভারতীয় সমতা চাইছেন, তাঁরা যে জেনে-শুনে ভুল করেছেন তা না-ও হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাঁরা ইউনিটি চাইছেন সত্য, কিন্তু ইউনিটি এবং ইউনিফর্‌মিটিতে গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ যদি আপন প্রাদেশিক সংস্কৃতি সভ্যতা আপন শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে গড়ে তোলে, তবে সেই সম্মিলিত সংস্কৃতিই হবে সত্যকার ভারতীয় সংস্কৃতি!

গুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে নিবেদন করি, তিনি বলেছিলেন, একতারা বাজানো সহজ, বীণা বাজানো কঠিন ; কিন্তু সেটা বাজাতে পারলে তার থেকে যে harmony বা বহুধ্বনি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঐক্যের যে-সঙ্গীত নির্মাণ করে তোলে, তার সঙ্গে একতারার ইউনিফর্‌মিটি'র কোনো তুলনাই হয় না।

বহু প্রদেশের নানাবিধ সঙ্গীত জেগে উঠে যে harmonyর সৃষ্টি হবে, সেই সত্যকার ভারতীয় ঐক্য-সঙ্গীত। তবেই 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা সফল হবে।

॥ ৫ ॥

হিন্দীর প্রসার এবং প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি—কিন্তু সে প্রসার যেন প্রাদেশিক এবং

আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্যকে গলা টিপে না মেরে ফেলে। হুঁশিয়ার হয়ে সে-প্রসার কর্ম সমাধান করলে কারোরই কোন আপত্তি থাকবে না। কি প্রকারে সেটা করা যেতে পারে, সে নিবেদন করার পূর্বে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে কয়টি আপত্তি বাঙলা দেশের কাগজে ইদানীং উঠেছে, তারই দু-একটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রধান এবং প্রথম আপত্তি, হিন্দীর লিঙ্গ বিভাগটা বড্ডই বদখদ। বাঙালী ভাবে, 'ছেলেটা যাচ্ছে', 'মেয়েটা যাচ্ছে' বললে যখন দিব্য অর্থ বুঝতে পারি তখন 'লড়কা জাতা হৈ' 'লড়কী জাতী হৈ' বলে মানুষকে বিরক্ত করা ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। এস্থলে বক্তব্য, 'অর্থ বুঝতে পারার' মান নিয়েই ভাষা সৃষ্ট হয় না। তাই যদি হত তবে বাঙলায় বলি না কেন, 'আমি গেলুম', 'তুমি গেলুম', 'সে গেলুম?' ইংরেজ তো খাসা এক 'ওয়েন্ট' দিয়েই বলে যায়, 'আই ওয়েন্ট', 'ইউ ওয়েন্ট', 'হি ওয়েন্ট'—অর্থ জলের মত পরিষ্কার, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তা নিয়ে গোসা করলে চলে না। এখন প্রশ্ন, হিন্দী যে লিঙ্গভেদ করে সেটা কি নিছক তারই 'পাগলামী', না অন্যান্য ভাষাও করে? বাঙলা এককালে কিছুটা করত, সে কথা সকলেই জানেন, এবং এখনও কিছুটা করে। 'সুন্দর রমণী' বলতে এখনো বাধো বাধো ঠেকে, এবং কোনো রমণীকে যদি বলি 'ওগো সুন্দর, গঙ্গাস্নানে চললে নাকি' তবে এখনো সেটা ভুল, 'সুন্দরী' বলতে হয়।

সংস্কৃতে যে লিঙ্গভেদ আছে এবং সে লিঙ্গভেদ যে সরল নয় সে কথাও সকলেই জানেন। প্রাণহীন বস্তু মাত্রই যে ক্লীব হয় তাও তো নয়। বহু নদনদী এ জীবনে দেখেছি কিন্তু কোনটারই নাম

পুংলিঙ্গ আর কোনটারই বা স্ত্রীলিঙ্গ—ক্লীবের তো কথাই উঠে না—সে তত্ত্বটি জলধারা দেখে ঠাহর করতে পারিনি। দিক্‌সুন্দরীর (ডিক্‌শনারীর) শরণাপন্ন হলে পর তিনি দিশেহারাকে দিক বাতলে দেন।

উত্তরে হয়ত বলবেন, সংস্কৃতের উদাহরণ এখন আর চলবে না। চালু ভাষা থেকে নজীর পেশ করো।

এই মুশকিলে পড়ে গেলেন। ফরাসী, জর্মন, রুশ, ইতালী, ওলন্দাজ, আরবী, গুজরাতী, মারাঠী এসব ভাষাতেই লিঙ্গভেদ আছে—এবং আরো বহু ভাষায় আছে বলে শুনেছি—, সত্য বলতে কি লিঙ্গভেদ নেই এরকম ভাষাই বিরল। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে, বড় ভাষার ভিতরে তিনটি মাত্র ভাষাতে লিঙ্গবিচার নেই—ইংরেজী, ফার্সী এবং বাঙলা। এ তিনটি ভাষা যতখানি ছাত্রত্রাস ব্যাকরণ বর্জন করতে পেরেছে অন্য ভাষাগুলো সে রকম পারেনি।

জর্মনের লিঙ্গ সবচেয়ে বেতালা বেহিসাব। 'ছুরি' 'কাঁটা' এবং 'চামচ' তিনটি শব্দই আমাদের কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী ক্লীব হওয়া উচিত অথচ জর্মন ভাষাতে 'ছুরি' ক্লীব, 'কাঁটা' স্ত্রীলিঙ্গ, এবং 'চামচ' পুংলিঙ্গ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'সূর্য' স্ত্রীলিঙ্গ, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনার 'চন্দ্রমা' পুংলিঙ্গ এবং 'নারী' ('ডাস ভাইব', 'ভাইব' = 'ওয়াইফ') ক্লীব লিঙ্গ! শুধু তাই নয়, সূর্যের চেয়েও দোর্দণ্ডপ্রতাপ জর্মন পুলিস বাহিনী ('ডী পোলিৎসাই') স্ত্রীলিঙ্গ!

পুনরপি পশ্চ, পশ্চ, ফরাসী এবং হিন্দীতে 'দাড়ি' স্ত্রীলিঙ্গ।

তবে কি দাড়ির জৌলুসের মালিক এককালে রমণীরা ছিলেন? পুরুষেরা পরবর্তী যুগে জোর করে কেড়ে নিয়েছেন? কিন্তু ভুলবেন না, গোঁফ হামেশাই দাড়ির উপরে!

তবে বলুন তো, ভদ্র, হিন্দীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? বরঞ্চ হিন্দী জর্মনের তুলনায় ভদ্রতর। জর্মনে তিনটে লিঙ্গ; 'লাগলে তাগ,

না লাগলে তুক্কা' করে যদি লিঙ্গবিচার করেন তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা ৩৩·৩ ভাগ; হিন্দীতে ৫০ ভাগ, কারণ হিন্দীতে মাত্র দুটি লিঙ্গ।

যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁরা হিন্দীর বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। হিন্দীতে বলি 'মৈঁ রোটী খাতা হূঁ' 'আমি রুটি খাই' কিন্তু অতীতকাল নিলে বলতে হয় 'মৈঁ নে রোটী খাঈ' 'আমি রুটি খেয়েছি'। অর্থাৎ অতীতকালে 'আমি' আর কর্তা থাকলুম না, কর্তা হয়ে গেলেন 'রুটি' এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গেল, কারণ 'রোটী' হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ ('পানী', 'ঘি', 'দহী', 'মোতী'র মত মাত্র কয়েকটি ই-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; তাই পুংভূষণ 'দাড়ি' বেচারী স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে)। তার মানে 'আমা-দ্বারা রুটি খাওয়া হল' বললে অনেকটা হিন্দীর ওজনে বলা হল। কিংবা 'পাগলে কি না বলে!' সংস্কৃতে এরকম জিনিস আছে একথা সকলেই জানেন।

কিন্তু এসব সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। একবার কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ জানা হয়ে গেলে বাদবাকি জট তিন লহমায় ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

লিঙ্গ নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে কোন লাভ নেই। আমরা যদি হিন্দীভাষীকে বলি লিঙ্গ তুলে 'লড়কা জাতা', 'লড়কী জাতা' বলা আরম্ভ করে দাও তবে ইংরেজ বাঙালীকে বলবে, 'আমি গেলুম', 'তুমি গেলুম', 'সে গেলুম' বলতে আরম্ভ করো। তাই ইংরেজ ফরাসী শেখার সময় ফরাসীর লিঙ্গবিচার নিয়ে আপত্তি তোলে না। চাঁদপানা মুখ করে মুখস্থ করে 'শব্দের অন্তে বি, সি, ডি, জি, এস, পি, কিউ, জেড্ থাকলে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়' অবশ্য বিস্তর ব্যতয় আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাসীতে হিন্দীর মত মাত্র দুটি লিঙ্গ—কিন্তু, আমার মনে হয়, ফরাসীতে লিঙ্গবিচার হিন্দীর চেয়ে শক্ত।

এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, হিন্দী বহু প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার

পর প্রাদেশিক অজ্ঞতাবশতঃ লিঙ্গে ভুল হতে আরম্ভ হবে এবং তারই ফলে হয়ত একদিন হিন্দী থেকে লিঙ্গ লোপ পেয়ে যাবে। তবে তার ফললাভ আমরা করতে পারবো না সে-কথা সুনিশ্চিত।

॥ ৬ ॥

হিন্দী বিরোধী সম্প্রদায় বলেন, হিন্দীতে এমন কি সাহিত্য আছে, বাপু, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হিন্দী শিখতে যাব? উত্তরে হিন্দী দল বলেন, তাবৎ ভারত যদি হিন্দী গ্রহণ করে সে-ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ করে তবে দেখতে না দেখতেই হিন্দী ইংরিজি ফরাসীর সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করবে।

এ উত্তরটা ইতিহাসের ধোপে টেকে না। সকলেই জানেন, এককালে লাতিন সর্ব ইউরোপের 'রাষ্ট্রভাষা' ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও লাতিন ভাষা গ্রীক কিংবা সংস্কৃতের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তারপর ফরাসী ভাষা লাতিনের আসনটি কেড়ে নিল। কিন্তু ফরাসী সাহিত্য যে বিত্তবান হল সেটা ইংরেজ, জর্মন, ইতালিয়দের ফরাসী সাহিত্য-চর্চা করার ফলে নয়—ফরাসীর ব্যাপক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ফরাসী যাঁদের মাতৃভাষা একমাত্র তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে। ঠিক সেই কারণেই প্রশ্ন, ক'টা বিদেশী ইংরিজিতে লিখে নাম করতে পেরেছে কিংবা কজন ইংরেজ ফরাসী জর্মনে লিখে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে? ইংরিজিতে ফিরে যাই: ফরাসীর পর এই যে ইংরিজি ভুবন জুড়ে রাজত্ব করল সে ভাষাতেই বা ক'টি বিদেশী নাম করতে পেরেছেন? এমন কি, কজন অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডাবাসী ইংরিজি সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের রচনা লিখতে সক্ষম হয়েছেন? এ জিনিসটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে

কি ভাষাকে টবে পুঁতে বিদেশে পাঠালে সেখানে সে বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেও ফল দিতে পারে না? আমেরিকার মত বিরাট দেশে তো আরো বেশী লেখকের জন্ম নেবার কথা ছিল—একদম পয়লা নম্বরের লেখক সে মহাদেশে জন্মেছেন কজন? অস্ট্রেলিয়া, কানাডা আমেরিকাবাসীর মাতৃভাষা ইংরিজি—তারাই যদি এ বাবদে কাহিল তবে যাঁদের মাতৃভাষা ইংরিজি নয় তাঁরাই বা কোন্ গন্ধমাদন উত্তোলন করতে পারবেন?

অথচ দেখুন, লাতিন ফরাসীর একচ্ছত্রাধিপত্য যেমন যেমন লোপ পেল সঙ্গে সঙ্গে জর্মন, ইংরিজি, ইতালি, রুশ, সুইডিশ, ওলন্দাজ সাহিত্য কী অল্প সময়ে কত না কত অদ্ভুত উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। তাই আজ আধমরা লাতিনের জায়গায় জেগে উঠেছে বহুতর ভাষা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে। তাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বহু ভাষার শিখর-তোরণ, মিনার-গম্বুজ দিয়ে গড়া 'ইউরোপীয় সাহিত্য' নামক এক গগনচুম্বী তাজমহল!

ইংরেজ ফরাসী ভাষায় লেখে না, ফরাসী জর্মনে লেখে না, রুশ দিনেমার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে যায় না; তথাপি এদের ভিতর আন্তরিক সহযোগিতার অন্ত নেই। আজ ফরাসী দেশে যে গঁকুর পুরস্কার পায় কালই তার বই ইংরিজিতে তর্জমা হয়ে যায়—অধিকাংশ স্থলে প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্বেই তর্জমা হয়ে গিয়েছে। আর নোবেল পেলে তো কথাই নেই—হুস হুস করে ডজনখানেক ভাষায় খান বিয়াল্লিশ তর্জমা বাজার গরম করে তোলে।

ইংরেজ গেছে, আপদ গেছে। এখন আমি স্বপ্ন দেখি—সুশীল পাঠক তুমিও যোগ দাও—ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যেন উত্তম উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং এক সাহিত্যের ভালো লেখা যেন অন্য সব সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজের মতলব ছিল প্রদেশে প্রদেশে যেন ভাবের আদান-প্রদান না হয়। তৎসত্ত্বেও আমরা ইংরিজির

মাধ্যমে একে অন্যকে কিছুটা চিনতে পেরেছি কিন্তু বহুস্থানেই অনেকখানি ভুল চেনাশোনা হয়েছে। এবারে সৎসাহিত্যের ভিতর দিয়ে আসল সদালাপ আরম্ভ হবে—আমরা এই স্বপ্ন দেখি।

বাঙলা বই হিন্দীতে অনুবাদ হবে, তারপর হিন্দী থেকে তামিলে —এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত হয় না। জ্যামিতি নাকি সপ্রমাণ করতে পারে, ত্রিভুজের যে কোনো এক বাহু যে কোনো দুই বাহুর চেয়ে হ্রস্বতর।

সোজাসুজি পরিচয় সবচেয়ে ভালো পরিচয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। একখানি পুস্তকের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার অন্ত নেই—এ সম্বন্ধে পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি—বইখানি স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য'।

লোকমান্য গীতার এই নবীন ভাষ্য মারাঠিতে লিখেছিলেন এবং তার এক অতি জঘন্য ইংরিজি অনুবাদ আছে—একদম অখাদ্য অপাঠ্য। কিন্তু বৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে-শেখা, মরচে-ধরা, জাম-পড়া, তাঁর মারাঠীজ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে বাঙলায় যে অনুবাদখানি করেছেন তার প্রশংসা করতে গিয়ে আমার অক্ষম লেখনী বার বার তার দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হয়। এ তো অনুবাদ নয়, এ যেন বাঙালী টিলক বাঙলায় লিখেছেন। মারাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে এ অধম সে পুস্তক বহুবার অধ্যয়ন করেছে, প্রতিবার মনে মনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, বন্ধুবান্ধবকে সে কেতাব-ই-কুৎব্-মিনার পড়তে অনুরোধ করেছে, এবং 'সত্যপীর' ছদ্মনামে সে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য 'আনন্দবাজারে' বিস্তর কান্নাকাটি করেছে।

এ বই পড়লে 'গীতা' নূতন করে চেনা যায় সে কথা অতি সত্য; কিন্তু উপস্থিত আমার নিবেদন, এ গ্রন্থ পড়লে মহারাষ্ট্র দেশকেও চেনা যায়। সংস্কৃত আজ সর্বত্রই মুমূর্ষু, কিন্তু কতখানি সংস্কৃত-চর্চা থাকলে পর এরকম গ্রন্থ বেরুতে পারে সেটা এ বই পড়লে

মহারাষ্ট্রের সেই ক্ষুদ্র পল্লী চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে বালক বালগঙ্গাধর সংস্কৃত-চর্চার মাঝখানে মানুষ হলেন। আমার গর্ব, আমি সে গ্রামে গিয়েছি, সে তীর্থ দেখেছি ॥*

* এ-প্রবন্ধ আমি বহু বৎসর পূর্বে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লিখি, কিন্তু তখনো রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেনি বলে---আমি জানতুম একদিন নেবেই নেবে, তাই আগেভাগেই সাবধানবাণী শোনাতে চেয়েছিলুম—(দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম প্রয়োজনাতীত তাণ্ডবরূপ ধারণ করে—সে তো তার বহু পরের ঘটনা !) আমার প্রিয় পাঠকবর্গ সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারেননি। ফলে, উৎসাহাভাবে, আমি প্রবন্ধটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিনি।

বন্ধ-বাতায়নে

॥ ১ ॥

ইংরেজকে যত দোষই দিই না কেন, ইংরিজি সভ্যতার যত নিন্দাই করি না কেন, ইংরেজ যে একটা মহৎ কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিক দিয়ে বহু জাত-বেজাত ইংলণ্ড দখল করেছে, অন্যদিক দিয়ে ইংরেজ বিশ্বভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে ইংলণ্ডে যে কত প্রকারের ভাব-ধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতী পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, রসবোধ পদ্ধতি, আদর্শানুসন্ধান যখন পৃথক ভাবে যাচাই করি তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না যে ইংরেজ কি করে সব কটাকে এক করে বহুর ভিতর দিয়ে ঐক্যের সন্ধান পেল।

কাব্যকলায় ইংরেজের যে খুব বেশী মৌলিকতা গুণ আছে তা নয় —ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলায় ইংরেজের দান অতি অল্পই—কিন্তু মনের সব কটি জানলা ইংরেজ সব সময়ই খোলা রেখেছে বলে বহু ভ্রমর তার ঘরে এসে নানা গুঞ্জন গান তুলেছে, নানা ফুলের সুবাস তার বৈদগ্ধ্যকে সুবাসিত করে তুলেছে। সে বৈদগ্ধ্যের প্রকাশও তাই সুভাষিত।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই নানা বস্তু অন্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার পিছনে রয়েছে সহিষ্ণুতা। এ গুণটি বড় মহৎ, এবং জর্মন জাতির এ গুণটি নেই বলেই তারা বহু প্রতিভাবান কবি, গায়ক, দার্শনিক পেয়েও কখনোই ইয়োরোপে একচ্ছত্রাধিপত্য করতে পারেনি।

ইংরেজ রাজত্বের সময় আমাদের প্রধান কর্ম ছিল ইংরেজকে খেদানোর কলকৌশল বের করা। আমরা সহিষ্ণু এবং উদার কিনা

ছুঁৎবাইগ্রস্ত এবং কূপমণ্ডুক—এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ এবং প্রয়োজন আমাদের তখন ছিল না।

এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সময় আজ এসেছে।

আমাদের বৈদেশিক রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের চরিত্রের উপর।

আমরা যদি হাম-বড়াই প্রমত্ত হয়ে দেশবিদেশে সর্বত্র এরকম ধারা ভাবখানা দেখাই যে কারো কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই, আমাদের পুরাণাদি অনুসন্ধান করলে এটম বম্ বানানোর কৌশল খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির সামনে যে লোক মাথা না নোওয়ায় সে আকাট মূর্খ, আমরা যদি দেশবিদেশে আপন সামাজিক জীবনে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে, নিমন্ত্রণ রেখে হৃদ্যতাযোগে সকলের সঙ্গে এক না হতে পারি তবে আমরা বৈদেশিক রাজনীতিতে মার খাব—বেধড়ক মার খাব, সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের সময় কত মার্কিন, ফরাসী, চেক্, বেলজিয়াম আমার কাছে ফরিয়াদ করেছে বাঙালীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তারা পেল না। এক মার্কিন আমাদের একখানা বাজে ইংরেজী কাগজের রবিবাসরীয় পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তোমরা যদি এ-রকম ইংরেজি লিখতে পারো তবে বাঙলাতে তোমাদের চিন্তাধারা কত না অদ্ভুত খোলতাই হয় তার সন্ধান পাব কি প্রকারে? বাঙলা শেখবার মত দীর্ঘকাল তো আর এদেশে থাকবো না, তাই অন্ততঃ দু-চারজন গুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, দু-দণ্ড রসালাপ আর তত্ত্বালোচনা করে লড়াইয়ের খুনকতলের কথাটা যাতে করে ভুলে যেতে পারি।"

আলাপ করিয়ে দিলুম কিন্তু জমলো না।

আমার বাঙালী বন্ধুরা যে জাত মানেন তা নয়, কিংবা মার্কিন ভদ্রলোকটি যে আমাদের ঠাকুরঘরে বসে গোমাংস খেতে চেয়েছিলেন

তাও নয়, বেদনাটা বাজলো অন্য জায়গায়।

আলাপ পরিচয়ের দু'দিন বাদেই ধরা পড়ে, আমাদের মনের জানলাগুলো সব বন্ধ। আমরা করি সাহিত্যচর্চা ও কিঞ্চিৎ রাজনীতি। নিতান্ত যাঁরা অর্থশাস্ত্র পড়েছেন, তাদের বাদ দিলে আমাদের রাজনীতিচর্চাও নিতান্ত একপেশে; আর আমাদের নিজেদের দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নৃত্য সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খানিকটে আছে বটে কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের আর পাঁচটা সম্পদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন।

তাই গালগল্প ভালো করে জমে না। যে আমেরিকান পঁচিশ-পদী খানা খায় তাকে দু'বেলা ডালভাত দিলে চলবে কেন? রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ করে করে তো আর দিনের পর দিন কাটানো যায় না।

এর চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এখনো আমাদের যেটুকু বৈদগ্ধ্য আছে, যে-সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের বেশীর ভাগ লোকই অচেতন সেটুকু গড়ে উঠেছে এককালে আমাদের মনের সব কটি জানলা খোলা ছিল বলে।

শুধু তাজমহল নয়, সমস্ত মোগল-পাঠান স্থাপত্য—জামি মসজিদ, আগ্রাদুর্গ, হুমায়ুনের কবর, সিক্রি এবং তার পূর্বেকার হৌজখাস, কুৎবমিনার সব কিছু গড়ে উঠলো ভারতবাসীর মনের জানলা খোলা ছিল বলে; দিল্লী আগ্রার বাইরে যে-সব স্থাপত্য শৈলী রয়েছে, যেমন ধরুন আহমদাবাদ বাঙলা দেশ কিংবা বিজাপুরে সেগুলোও তাদের পবিপূর্ণতা পেয়েছে, এককালে আমাদের মনের দরজা খোলা ছিল বলে; খানসাহেব আব্দুল করীম খান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে চরমে পৌঁছতে পেরেছিলেন তার সোপান নির্মিত হয়েছে ভারতীয় পূর্বাচার্যগণের ঔদার্যগুণে।

এই বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যই নিন। বৌদ্ধচর্যাপদে তার

জন্ম, তার গায়ে বৈষ্ণবপদাবলীর নামাবলী, 'মঙ্গল'-মুকুট তার শিরে, আরবী-ফারসী শব্দের খানা খেয়েছে সে বিস্তর আর তার কথার ফাঁকে ফাঁকে যে ইংরিজি বোল ফুটে ওঠে তার জ্বালায় তো মাঝে মাঝে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে।

আর কিছু না হোক আরবী ফারসীর যে-দুটো জানলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি—যেগুলো সামান্য ফাঁক করে দিয়েই কবি নজরুল ইসলাম আমাদের গায়ে তাজা হাওয়া লাগিয়ে দিলেন—সেগুলোই যদি আমরা পুনরায় খুলে ধরি তা হলে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, লীবিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে। আফগানিস্থান ও ইরানে ফার্সী প্রচলিত আর বাদবাকি দেশ আরবী।

স্বার্থের সন্ধানে একদিন আমরা তাদের কাছে যাবো, তারাও আমাদের অনুসন্ধান করবে। তখন যদি তারা আমাদের যতটা চেনে তার চেয়ে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী হয় তবে আমরাই জিতব।

আর পূবের জানলাও তো খুলে ফেলা সহজ। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক তো ভারতের পিটকেই বন্ধ আছে। ত্রিশরণ তিরত্নের রত্নাকর তো আমরাই।

॥ ২ ॥

পশ্চিমের জানলা খুললে দেখতে পাই, পাকিস্তান ছাড়িয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব দেশের পর ভূমধ্যসাগর, অর্থাৎ ভারত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ভূমি মুসলিম। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল ভূখণ্ড যদি ধর্মের উদ্দীপনায় ঐক্যলাভ করতে পারে তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-পঞ্চায়েতে এদের উচ্চকণ্ঠ কি মার্কিন, কি রুশ কেউই অবহেলা করতে পারবে না।

তার পূর্বে প্রশ্ন, বহুশত বৎসর ধরে এ-ভূখণ্ডে কোনো প্রকারের স্বাধীন ঐক্য যখন নেই তখন আজ হঠাৎ কি প্রকারে এদের ভিতর একতা গড়ে তোলা সম্ভব? উত্তরে শুধু এইটুকু বলা চলে যে এ-ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন কট্টর জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হয়নি। তাই আজ যদি প্রাণের দায়ে এরা এক হয়ে যায়!

ঐক্যের পথে অন্তরায় কি?

প্রথম অন্তরায় ধর্মই। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যেমন বর্মা চীন এবং অন্যদিকে মুসলিম ভূমি ঠিক তেমনি শীয়া ইরানের একদিকে সুন্নী আফগানিস্থান পাকিস্তান এবং ভারতীয় মুসলমান, অন্যদিকেও সুন্নী আরাবিস্থান। শীয়া ইরানের সঙ্গে সুন্নী আফগানিস্থানের মনের মিল কখনো ছিল না, এখনো নেই। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্যটা খোলসা হবে; আফগান বিদগ্ধজনের শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা ফার্সী, আর ইরানের ভাষা তো ফার্সী বটেই, তৎসত্ত্বেও কাবুলের লোক কস্মিনকালেও ইরানে লেখা-পড়া শেখবার জন্য যায় নি এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তারা লেখা-পড়া এবং ধর্ম-চর্চার জন্য আসতো ভারতবর্ষে, এখনো আসে, যদ্যপি সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশের লোকই ফার্সীতে কথা বলে না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তাই ছিল—আফগানিস্থান এককালে বৌদ্ধ ছিল, তার পূর্বে সে হিন্দু ছিল, কিন্তু ইরানী জরথুস্ত্র ধর্ম সে কেখনো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি।

ইরান আফগানিস্থানে তাই অহরহ মনোমালিন্য। আফগানিস্থান ও ইরান সীমান্ত নিয়ে দু'দিন বাদে বাদে ঝগড়া লাগে ও আজ পর্যন্ত সে-সব ঝগড়া-কাজিয়া ফৈসালা করার জন্য কত যে কমিশন বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। আফগানিস্থানের পশ্চিমতম হিরাত ও ইরানের পূর্বতম শহর মেশেদে প্রায়ই শীয়া-সুন্নীতে হাতাহাতি মারামারি হয়। আফগান ইরানেতে বিয়ে শাদী হয় না, কাবুলরাজ

কখনো তেহরান যান না, ইরান অধিপতিও কখনো কাবুলমুখো হন না। ব্যত্যয় আমানউল্লা খান এবং তাঁর ইরান গমনের সংবাদ পেয়ে আফগানরা কিছুমাত্র উল্লসিত হয়নি।

ওদিকে যেমন ইরানের সঙ্গে আফগানিস্থানের মনের মিল নেই, এদিকে তেমনি আফগান পাকিস্তানীতে মন-কষাকষি চলছে। সিন্ধুর পশ্চিম পার থেকে আসল পাঠানভূমি আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব আফগানিস্থানের উপজাতি সম্প্রদায়ও পাঠান। তাই আফগান সরকারের দাবী, পাকিস্তানের পাঠান হিস্যাটা যেন তার জমিদারীতে ফেরত দেওয়া হয়। এ দাবীটা আফগানিস্থান ইংরেজ আমলে মনে মনে পোষণ করত, কিন্তু ইংরেজের ডাণ্ডার ভয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করত না।

এই তো গেল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরানের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বা আঁতাঁৎ কর্দিয়ালের কেচ্ছা!

ওদিকে আবার ইরান আরবে দোস্তী হয় না। প্রথমতঃ ধর্মের বাধা—ইরান শীয়া, আরব সুন্নী; দ্বিতীয়তঃ ইরানীরা আর্য, আরবরা সেমিতি, তৃতীয়তঃ ইরানের ভাষা ফার্সী, আরবের ভাষা আরবী।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর বাধা হয়েছে এই যে, খুদ আরব ভূখণ্ড ঐক্যসূত্রে গাঁথা নয়। খুদ আরবভূমি যদি এক হয়ে ইরানের উপর তার বিরাট চাপ ফেলতে পারত তবে হয়ত ইরান প্রাণের দায়ে ভালো হোক মন্দ হোক কোনো প্রকারের একটা দোস্তী করে ফেলত (তা সে-'আঁতাঁৎ' হার্দিক, 'হার্টি', অর্থাৎ 'কর্দিয়াল' হল আর নাই হল) কিন্তু তাবৎ আরব ভূখণ্ডকে এক করবার মত তাগদ আজ কারো ভিতরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আরবভূমি আজ ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, ট্রান্স্-জর্ডান, সউদী আরব, প্যালেস্টাইন ও ইয়েমেন এই সাত রাষ্ট্রে বিভক্ত। তাছাড়া, কুয়েৎ, হাদ্রামুত, অধুনা 'নির্মিত' আদন ইত্যাদি ক-গণ্ডা উপরাষ্ট্র আছে সে তো অশুমার! এদের সকলেরই ভাষা ও ধর্ম এক ও

তৎসত্ত্বেও এদের ভিতর মনের মিল নেই। এবং সে ঐক্যের অভাব এই সেদিন মর্মন্তুদরূপে সপ্রমাণ হয়ে গেল—যেদিন কথা নেই বার্তা নেই আড়াই গণ্ডাই ইহুদী হঠাৎ উড়ে এসে আরবীস্থানের বুকের উপর প্যালেস্টাইনে জুড়ে বসল। যে আরব হাজারো বৎসর ধরে প্যালেস্টাইনের পাথর নিংড়ে সরস জাফা কমলালেবু বানিয়ে নিজে খেত, দুনিয়াকে খাওয়াত, সেই আরবের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করল আড়াই গণ্ডা 'রণভীরু' ইহুদী! আরব রাষ্ট্রেরা আপন গৃহকলহ নিয়ে মশগুল—ওদিকে প্যালেস্টাইন পয়মাল হয়ে গেল।

লেবাননকে বাদ দিয়ে আরব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্—কারণ লেবানন রাষ্ট্রে মুসলিম-আরবের চেয়ে খৃষ্টান-আরবের সংখ্যা একটুখানি বেশী; লেবাননের খৃষ্টান আরবেরা ইহুদীদের সঙ্গে দোস্তী করতে চায় না একথা খাঁটি এবং তারা হয়ত বৃহত্তর আরবভূমির পঞ্চায়েতে হাজিরা দিতে রাজী নাও হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, কারণ লেবানন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রাষ্ট্র।

আসল লড়াই দুই পালোয়ানে। এদের একজন আমীর আব্দুল্লা, ট্র্যান্স-জর্ডানের রাজা, অন্যজন মক্কা-মদীনা, জিন্দা-নেজদের রাজা ইবনে সউদ। আব্দুল্লার বংশই ইরাকে রাজত্ব করেন, কাজেই এ দু'রাষ্ট্রে মিতালি পাকা, কিন্তু ইবনে সউদ একাই একশ। কারণ রাজা বলতে আমরা যা বুঝি সে হিসেবে আজকের দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই খাঁটি রাজা। আব্দুল্লার পিছনে রয়েছে ইংরেজের অর্থবল, বাহুর দম্ভ; কিন্তু ইবনে সউদ কারো তোয়াক্কা করে আপন রাজ্য চালান না। মার্কিনকে তেল বেচে তিনি এযাবৎ কয়েকশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন বটে, তবু মার্কিন তাঁর রাজত্বে কোনো প্রকারের নাম-প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মক্কার কাবা শরীফের তদারকদার—বিশ্ব মুসলিম, সেই খাতিরে তাঁকে কিছুটা মানেও বটে।

যেন ঘোঁটালাটা যথেষ্ট প্যাঁচালো নয় তাই মিশরকেও এই সম্পর্কে স্মরণ করতে হয়। কারণ মিশরবাসীর শতকরা নব্বুই জন আরবীতে কথা বলে, ধর্ম তাদের ইসলাম ও তাদের বেশীর ভাগের রক্তও আরব-রক্ত। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ইসলাম এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অছি কাইরোর সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অল-অজহর। আরব, আফগানিস্থান, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মালয়, জাভা, এককথায় তাবৎ দুনিয়ার কুল্লে ধর্মপ্রাণ মুসলিমের আন্তরিক কামনা অজহরে ধর্মশিক্ষা লাভ করবার।

তদুপরি মিশর প্রগতিশীল এবং বিত্তশালী রাষ্ট্রও বটে।

কিন্তু মিশরের উপরে রয়েছে ইংরেজের সরদারী।

সেই হল আরেক বখেড়া। আরবদের ভিতর ঝগড়া-কাজিয়া তো রয়েছেই তার উপর আবার আরব হাঁড়ির ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে বসে আছেন ইংরেজ এবং স্বয়ং মাকিন চতুর্দিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হাঁড়ির কিছুটা স্নেহজাতীয় পদার্থ ইতিমধ্যেই তাঁর আঙ্গুলকে কিঞ্চিৎ চেকনাই এনে দিয়েছে—সেকথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

তাই সব কিছু ছয়লাপ করে দেয় তেলের বন্যা। ইরান ইরাকের তেল ইংরেজের, আর সউদী আরবের তেল মার্কিনের। পাঠক বলবেন, তাহলেই হল, ব্রাদারলি ডিভিশন, কিন্তু সুশীল পাঠক, আপনি উপনিষদ পড়েননি তাই এ-রকম ধারা বললেন। ভূমৈব সুখম্—অল্পে সুখ নেই। মার্কিন চায় তৈলযজ্ঞের একক পুরোহিত হতে, আর ইংরেজ চায় মার্কিনকে দরিয়ার সে-পারে খেদাতে।

কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়েছি। কোথায় আফগানিস্থানের প্রস্তরময় শৈলশিখর আর কোথায় স্নেহভরে ডগমগ আরবের পাতাল-তল। এ সবকিছুর হিসেব-

নিকেশ করে পররাষ্ট্র নীতির হদিস বানানো তো সোজা কর্ম নয়।

. আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এ-দেশের বিস্তর লোক আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাই জানেন। ইচ্ছে করলে এঁদের সম্বন্ধে আমরা নিজের মুখেই ঝাল খেতে পারি।

তাই বলি খোলো খোলো জানলা খোলো ॥*

* এ প্রবন্ধটি লিখি ১৩৫৬ (১৯৪৯ খৃঃ) সালে—(অর্থাৎ দেশে-বিদেশে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়)। ইতিমধ্যে আরব ভূখণ্ডে রাজার বদলে কোনো কোনো জায়গায় ডিকটেটর হয়েছেন, মিশর থেকে ইংরেজ অনেক দূরে হটে গিয়েছে। নইলে এ প্রবন্ধের মূল দর্শন তখন যা ছিল, আজও তাই। আমি তাই প্রবন্ধের কোনো পরিবর্তন করিনি।

এ্যারোপ্লেন

॥ ১ ॥

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম এ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম।* দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারী বা 'জয়-রাইড' নয়, রীতিমত দু'শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়তো পুষ্পক-রথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করবো—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ তো জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।' সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারেই লক্ষ্য করি পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধে' বলাই ছিল উচিত কারণ প্লেনে সফর করার মত পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যেসব হতভাগ্য প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাঁদের এযাবৎ হয়নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন—ব্যস হয়ে গেল। অবশ্য

* এটি লেখা হয় ১৯৫৩ খৃষ্টে—তাহলে বলতে হয় ৩৮ বৎসর পূর্বে।

আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু এ-কথা বলবো, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষমুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনো-গতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার যো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'এ্যার আপিসে।' এক হাওড়া স্টেশন থেকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, গৌহাটি এমনকি ব্যাণ্ডেল-হুগলী হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত যেতে পারেন কিন্তু একই 'এ্যার আপিস' আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না—কেউ দেবে ঢাকা আর আসাম, কেউ দেবে মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লীর।

এবং এ-সব এ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশির ভাগই ট্রামলাইন, বাস-লাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে, এ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

এ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিয়ো অফিসার তো উর্দী পরে আছেনই—এমনকি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল-সোনালির ব্যাজ-বিল্লা-রিবন-পট্টী—যা খুশী বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু, গার্ড সাহেবরা উর্দী পরেন কিন্তু সে উর্দী জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দী থেকে স্বতন্ত্র—এ্যার আপিসে কিন্তু এমনই উর্দী পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে ঘুম্ করে একটা সলুট মেরে ফেলে।

তারপর সেই উর্দী পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরিজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি-কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী তবু ইংরিজি বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন—

বি.এ. এম.এ. পাস করেছেন—কিন্তু আমি মশাই, পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরিজি বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরিজি বুঝতে পারিনে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাঙলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্ততঃ তিনি আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্‌খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধে এই যে পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন আপনি ঠিক সময় দমদমা উপস্থিন না হতে পারায় প্লেন মিস করলেন। রেলের বেলা আপনি তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকা কিংবা তারো কম খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সে-টি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আরেক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে করে ট্র্যাভেল করেছেন, এ্যার কোম্পানীও স্বীকার করলো কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। এ্যার কোম্পানীর ডবল লাভ! এ-নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা লাগালে কি হবে বলতে পারিনে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই এ্যার কোম্পানীর চেয়ে একটুখানি বেশী।

টিকিট কেটে তো বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহামূল্যবান 'মূল্য-পত্রিকা'-খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদমা থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু এ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কি? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও তো আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া

যাইনে—কাছাকাছির সফর হলে তো আধঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া!) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে তো আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়। আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু'ঘণ্টা, অথচ আপনাকে এ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকি দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরো কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পৌণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব,

'সোনা-মুগ সরু চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল
আমসত্ব আমচুর—'

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারো উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাক বাঙলোয়। বিছানা—বিশেষ করে মশারি—বিন কি করে গোঁয়াবেন দিন-রাতিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তা হলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোনো লাভ হত না কারণ জিনিসটিকে ওজন তো করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

এ্যার ট্র্যাভেল করবেন—মাত্র বিয়াল্লিশ পৌণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পর বলবো—রওয়ানা দিলেন এ্যার আপিসের দিকে, ছাতা-বরসাতি-

এটাচি হাতে, তার জন্য ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ!)। ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু'একজন বন্ধু-বান্ধব! যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস্ করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওয়ানা দিলেন এবং এ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাত-ভাই বাঙালরা যে রকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

এ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে লোকটা কুলি-চাপরাসীর সমন্বয়— তা হোক্‌গে কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দীতে'—রাষ্ট্রভাষাতে— অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে রকম তার বসের ইংরেজি বলার বাই, অথচ উভয় পক্ষই বাঙালী। আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাঙলা দেশের মহানগরী রামমোহন রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস-আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলা ভাষার' কী কদর, কী সোহাগ!

॥ ২ ॥

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি তাই আমাদের এ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মসুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের এ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সেগুলো বানানো হয়েছিল একদম সায়েবি কায়দায়। বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল, তার উপরে থাকতো মাসিক, দৈনিক, এ্যাশট্রে আরো কত কি। সাহস হত না বসতে, পাছে জামা-কাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর

উর্দীই তো আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী তুরুস্ত, ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে ছুটির আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয়নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে —সমস্তটা নোংরা, এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরিজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারি, ডিসম্‌ল্‌।

একটা এ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, আসুন একদিন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাশায়ী লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাসা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুশতাক আলীর মত ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—' মুখুয্যে যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুয্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে—মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবিঠাকুর কি একটা গান রচেছেন না?

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরের সুরে সুর মেলাতে—

এ্যার কোম্পানীর বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে-আনা যেসব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম আমাদের এ্যার কোম্পানীর বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবিস্থানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে কোনো একটা দু'দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর কোন খেদ থাকবে না।

মধ্য কলকাতা থেকে দমদম ক'মাইল রাস্তা সে খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে :—

'যেন পেরিয়ে এলেন অন্তবিহীন পথ।'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বেসরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্সাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ জন যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরী এই ঢাউস বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কি, আপনিই বা বলবেন কি?

দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয়নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদমা পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত এক-টানা প্রতীক্ষা। সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক এ্যার-পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢাকা পর্দা-নশিনী হজযাত্রিনী সব কিছুই

চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে এ-কথাও ঠিক হাওড়ার প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম। প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুতোহুতি গুঁতোগুঁতি করার কি প্রয়োজন ?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিনকয়েক পূর্বে দমদম এ্যার-পোর্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক গেলাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলোনো হচ্ছে ? বয় বললে, জলের ট্যাঁকি সাফ করা হয়েছে তাই জল ঘোলা এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে ও-জল না-খাওয়াই ভালো।

শুনেছি, ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে নরনারী এমন কি বাচ্চা-কাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি ট্যাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাবো। শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই তখন রুটির বদলে কেক খাবো। সে কথা থাক্ !

কিন্তু দমদম এ্যার-পোর্টের সত্যিকার জৌলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি।

ভোর থেকে যেসব প্লেনের দমদমা ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারেনি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে এ্যার-পোর্টে। আরো যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না। করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। একদিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে আসছে, এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য এ্যার কোম্পানীর কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানারকমের গুজোব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—

যেসব বন্ধুরা 'সী অফ্' করতে এসেছিলেন তাদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ্' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাষ্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানীগুলো গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত ---আরো কত কি ?

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়েনি। খবর দেবেই বা কি ?

দমদমা নর্থ-পোল হলে কি হত জানিনে—শেষটায় কুয়াশা কাটলো। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কি নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরিজি বুঝিনে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেননি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা এ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে-প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানীর লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে— পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল তো অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেন চড়ছে— তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে না কাহে ?'

ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৩ ॥

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-পর্বত, গৃহ-অট্টালিকা অতিশয় দ্রুতগতিতে তাঁর চক্ষের সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুণার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খপোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কি প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমন মহর্ষি কোনো একটি ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নিচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসেছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমাকে এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করে বলেছিলুম,

'পীরহা নমীপরন্দ্,
শাগিরদান উম্বারা মীপরানন্দ্।'

অর্থাৎ 'পীর (মুরশাদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)'।

তার কিছুদিন পরে আমি রমন মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামলাই (শ্রীআন্নামলাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামলাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমনাশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছুই খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কি রকম অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগলো।

আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমন মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হননি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কিরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন—কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় মেরে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় এ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল এ্যার-ড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্প-পোস্ট থেকে ; কিন্তু যেই প্লেন শ-পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছিনে।

উপরের থেকে নিচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকোল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট তো দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সবকিছু

যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নিচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা গঙ্গা! অপরাধ নিও না মা, তোমাকে পবননন্দন-পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা তো এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুণতি ক্ষুদে ক্ষুদে মানওয়ারি জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর পানসি-ডিঙির তো লেখা-জোখা নেই। এত দিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে, জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কি এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কি দেখি?—' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পারো।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়লো মা গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে। সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কি সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের— রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য? কিন্তু এ আমি সইব কি করে? তোমার দক্ষিণ

মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষন্, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলবো,

> 'হে পূষন, সংহরণ
>
> করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
>
> এবার প্রকাশ করো
>
> তোমার কল্যাণতম রূপ,
>
> দেখি তারে যে-পুরুষ
>
> তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ করো, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন-যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরীসব শুধু মাত্র তাঁদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা তো রয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল—তাই বলেছেন,

> 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গ দল রক্ত-আঁখি!'

অস্ট্রিচ পাখি যে রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর, স্যর!' এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রে'তে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি ল্যাবেঞ্চুস্! লাল, পিলা, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে

নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন এইটে দোলাও দিকিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে!'

এদিকে রসভঙ্গ করলো, ওদিকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহা বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট তো! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস; অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশির ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস্ নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে এদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ঐ বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ওমা ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙলো। ওকে তো আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে,

> 'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ-সংসারে
> তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে ও-পারে'॥

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কি? রস নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেয়। কিন্তু যখন কোনো জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ প্রশ্নও ওঠে, যে-সব লোক এ আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালী চরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথিপ্রবন্ধ থাকতো তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতো। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী,' 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না',—সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন. 'বাঙালী মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে', কিংবা ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লীতেও প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ কান খোলা খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজোব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনো দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলো জিনিস স্পষ্ট বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ, অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লীর মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলেব। দিল্লীর রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে)। এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনো হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব বাঙলার লোক পশ্চিম বাঙলায় এসে অনেক করেছে কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া উত্তর শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি। এবং এস্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসা-বিশেষের চাকরি সেখানে সে চাকুরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের দশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের

অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায়, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এইসব চাকরি পাচ্ছে ক'জন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কি? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জন-সংখ্যার হিসেবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লীবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবে, 'না, না, না।' পরশ্রীকাতর অবাঙালীও সে-ঐক্যতানে যোগ দেয়। মনে মনে হয়তো বলে 'ভালোই হয়েছে'।—তা সে-কথা থাক্।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। সে কেন পারলে না, সেই সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। আরো একটু ধৈর্য ধরুন।

(৫) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লীর সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনো তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লীতে যা ভেল্কিবাজি দেখালে সে-কেরামতী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল্ থিয়েটার চালায় চাটুয্যে। দিল্লীতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকিলবাবুর তাঁবেতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম, কারণ তিনি সরকারি নোকরি করেন। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবির।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লী ছাড়িয়েও কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, 'কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকার' জন্য?'

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ সে স্পর্শকাতর। তাই সে সেন্‌সিটিভ এবং অভিমানী।

আলীপুর বোমা মামলার সময় শমস্থল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর আসামীদের সঙ্গে পীরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলতো, 'হে শমস্থল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর শ্যাম এবং ঐ স্পর্শকাতরতাই তার শূল। শুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যেরকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সেরকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিসুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়াধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর; তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোনো জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি,

কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানবো কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন বস্তু—স্পর্শকাতরতা না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দিল্লী,

১৩৬৩॥

গান্ধীজীর দেশে ফেরা

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইতালি থেকে জাহাজে ফিরছিলুম : ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে নূতন জাহাজ, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়। যাত্রীপালের সুখস্সুবিধার তদারক করনেওয়ালা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাকে বললুম, "এরকম সাফ্‌সফা জাহাজ কখনো দেখিনি।"

সে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললে, "হবে না! নূতন জাহাজ! তার উপর এই কিছুদিন আগে তোমাদের মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে দেশে ফেরেন।"

আমার অদ্ভুত লাগল। মহাত্মাজী শরীর খুব পরিষ্কার রাখেন জানি, কাপড়-চোপড়, বাড়ী-ঘর-দোরও, কিন্তু এত বড় জাহাজখানাও কি তিনি মেজে ঘষে—? বললুম—"সে কি কথা?"

স্টুয়ার্ড বললে—"মশায়, সে এক মস্ত ইতিহাস। এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছি। ইংরেজ যদি ঘন ঘন গোলটেবিল বৈঠক বসায়, আর তোমাদের ঐ গাঁধী যদি নিত্যি নিত্যি এই জাহাজে যাওয়া আসা আরম্ভ করেন, তবে আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না।"

আমি বললুম—"তোমার কথাগুলো নতুন ঠেকছে। গান্ধীজী তো কাউকে কখনো জ্বালাতন করেন না।"

স্টুয়ার্ড বললে—"আজব কথা কইছেন স্যার : কে বললে গাঁধী জ্বালাতন করেন? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি! ব্যাপারটা তাহলে শুনুন—

ইতালির বন্দরে জাহাজ-বাঁধা। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি-ঘুমোচ্ছি, কাজকর্ম চুকে গেছে, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, শুনতে পেলুম কাপ্তেন সাহেব পাগল হয়ে গেছেন। ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে

দেখি তিনি দু হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর সাতান্নবার করে একই টেলিগ্রাম পড়ছেন। খবর সবাই জেনে গেছে ততক্ষণে। ইল্ দুচে (অর্থাৎ মুস্‌সোলীনি) তার করেছেন, মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে করে দেশে ফিরছেন। বন্দোবস্তের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

তারপর যা কাণ্ড শুরু হল, সে ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। গোটা জাহাজখানাকে চেপে ধরে ঝাড়ামোছা, ধোওয়া-মাজা, মালিশ-পালিশ যা আরম্ভ হল, তা দেখে মনে হল ক্ষয়ে গিয়ে জাহাজখানা কপ্‌পুর হয়ে উবে যাবে। কাপ্তেনের খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। যেখানে যাও, সেখানেই তিনি তদারক করছেন। দেখছেন, শুনছেন, শুঁকছেন, চাখছেন, আর সবাইকে কানে কানে বলছেন, 'গোপনীয় খবর, নিতান্ত তোমাকেই আপনজন জেনে বলছি, মহাত্মা গাঁধী আমাদের জাহাজে করে দেশ ফিরছেন।' এই যে আমি, নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমাকেও নিদেনপক্ষে বাহান্নবার বলেছেন ঐ খবরটা যদিও ততদিন সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে গাঁধীজী এই জাহাজে যাচ্ছেন ; কিন্তু কাপ্তেনের কি আর খবরের কাগজ পড়ার ফুরসত আছে ?

আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের শৌখিন কেবিন (কাবিন্ দ্য ল্যুক্‌স্) গুলো দেখেছেন ? সেগুলো ভাড়া নেবার মত যখের ধন আছে শুধু রাজা-মহারাজাদের আর মার্কিন কারবারীদের। সেবারে যারা ভাড়া নিয়েছিল তাদের তার করে দেওয়া হল, 'তোমাদের যাওয়া হবে না, গাঁধীজী যাচ্ছেন।' আধেকখানা জাহাজ গাঁধীজীর জন্য রিজার্ভ—পল্টনের একটা দল যাবার মত জায়গা তাতে আছে।

শৌখিন কেবিনের আসবাবপত্র দেখেছেন কখনো ? সোনার গিল্টি রুপোর পাতে মোড়া সব। দেয়ালে দামী সিল্ক, মেঝেতে ঘন সবুজ রঙের রবর আর ইরানি গালচে—ছ ইঞ্চি পুরু—পা দিলে পা বসে যায়। সেগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হল। ইল্ দুচে বিশেষ

করে পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া (অর্থাৎ ভেনিসীয়-রাজপ্রাসাদ) থেকে চেয়ার-টেবিল, খাটপালঙ্ক পাঠিয়েছেন। আর সে খাট, মশয়, এমন তার সাইজ, ফুটবলের বি টীমের খেলা তার উপরে চলে। কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে কি করে! আন্ মিস্ত্রী, ডাক্ কারিগর, খোল্ কবজা, ঢোকা খাট। হৈ হৈ ব্যাপার—মারমার কাণ্ড। খাবার-দাবার আর বাদবাকী যা সব মালমশলা যোগাড় হল, সে না হয় আরেক হপ্তা ধরে শুনবেন।

সব তৈরী। ফিট্‌ফাট্। এই যে বললেন, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়, ছুঁচটি পড়লে মনে হয় হাতী শুয়ে আছে।

গাঁধীজী যেদিন আসবেন সেদিন কাগ কোকিল ডাকার আগে থেকেই কাপ্তেন সিঁড়ির কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে, পিছনে সেকেণ্ড অফিসার, তার পিছনে আর সব বড়কর্তারা, তার পিছনে বড় স্টুয়ার্ড, তার পিছনে লাইব্রেরিয়ান, তার পিছনে শেফ্ দ্য কুইজিন (পাচকদের সর্দার), তার পিছনে ব্যাণ্ড বাদ্যির বড়কর্তা, তার পিছনে—এক কথায় শুনে নিন, গোটা জাহাজের বেবাক কর্মচারী। আমি যে নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমার উপর কড়া হুকুম, নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু। বড় স্টুয়ার্ডের কাছে যেন চব্বিশ ঘণ্টা থাকি। আমার দোষ? দু-চারটে হিন্দী কথা বলতে পারি। যদি গাঁধীজী হিন্দী বলেন, আমাকে তর্জমা করতে হবে। আমি তো বলির পাঁঠার মত কাঁপছি।

গাঁধীজী এলেন। মুখে হাসি, চোখে হাসি। 'এদিকে স্যর, এদিকে স্যর'—বলে কাপ্তেন নিয়ে চললেন গাঁধীজীকে তাঁর ঘর—কেবিন দেখাতে। পিছনে আমরা সবাই মিছিল করে চলেছি। কেবিন দেখান হল,—এটা আপনার বসবার ঘর, এটা আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন তাঁদের অপেক্ষা করার ঘর, এটা আপনার পড়ার, চিঠিপত্র লেখার ঘর, এটা আপনার উপাসনার ঘর, এটা আপনার খাবার ঘর যদি বড় খাস কামরায় যেতে না চান, এটা

আপনার শোবার ঘর, এটা আপনার কাপড় ছাড়ার ঘর, এটা আপনার গোসলখানা, এটা চাকরবাকরদের ঘর। আর এ অধম তো আছেই—আপনি আমার অতিথি নন, আপনি রাজা ইমান্নুয়েল ও ইল্ দুচের অতিথি। অধম রাজা আর দুচের সেবক।'

গাঁধীজী তো অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, আপনার জাহাজখানা ভারী সুন্দর। কেবিনগুলো তো দেখলুম; বাকী গোটা জাহাজটা দেখারও আমার বাসনা হয়েছে। তাতে কোন আপত্তি –?'

কাপ্তেন সায়েব তো আহ্লাদে আটখানা, গলে জল। গাঁধীজীর মত লোক যে তাঁর জাহাজ দেখতে চাইবেন এ তিনি আশাই করতে পারেননি। 'চলুন, চলুন' বলে তো সব দেখাতে শুরু করলেন। গাঁধীজী এটা দেখলেন, ওটা দেখলেন, সব কিছু দেখলেন। ভারী খুশী। তারপর গেলেন এঞ্জিন-ঘরে। জানেন তো সেখানে কি অসহ্য গরম। যে-বেচারীরা সেখানে খাটে তাদের ঘেমে ঘেমে যে কি অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারবেন না। আপনি গেছেন কখনো?"

আমি বললুম, "না।"

"গাঁধীজী তাঁদের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপ্তেনের মুখেও হাসি নেই। আমাদের কাপ্তেনটির বড় নরম হৃদয়; বুঝতে পারলেন গাঁধীজীর কোথায় বেজেছে।

খানিকক্ষণ পরে গাঁধীজী নিজেই বললেন, 'চলুন কাপ্তেন।' তখন তিনি তাঁকে বাকী সব দেখালেন। সব শেষে নিয়ে গেলেন খোলা ডেকের ওপর। সেখানে কাঠফাটা রোদ্দুর। কাপ্তেন বললেন, 'এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবেন না, স্যার। সর্দিগর্মি হতে পারে।'

গাঁধীজী বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, এ জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিন, আমি তাতেই থাকব।' কাপ্তেনের চক্ষুস্থির! অনেক

বোঝালেন, পড়ালেন। গাঁধীজী শুধু বলেন, 'অবশ্যি আ-প-না-র যদি কোন আপত্তি না থাকে।' কাপ্তেন কি করেন। তাঁবু এল, খাটানো হল। গাঁধী সেই খোলা ছাদের তাঁবুতে ঝাড়া বারোটা দিন কাটালেন।

কাপ্তেন শয্যাগ্রহণ করলেন। জাহাজের ডাক্তারকে ডেকে বললেন, 'তোমার হাতে আমার প্রাণ। গাঁধীজীকে কোন রকমে জ্যান্ত অবস্থায় বোম্বাই পৌঁছিয়ে দাও। তোমাকে তিন ডবল প্রমোশন দেব'।"

আমি অবাক হয়ে শুধালুম,—"সব বন্দোবস্ত ?"

স্টুয়ার্ড হাতের তেলো উঁচিয়ে বললো, "পড়ে রইল। গাঁধীজী খেলেন তো বক্রীর দুধ আর পেঁয়াজের শুরুয়া। কোথায় বড় বাবুর্চি, আর কোথায় গাওনা-বাজনা। সব ভণ্ডুল। শুধু রোজ সকালবেলা একবার নেবে আসতেন আর জাহাজের সবচেয়ে বড় ঘরে উপাসনা করতেন। তখন সেখানে সকলের অবাধ গতি-- কেবিনবয় পর্যন্ত।

কাপ্তেনের সব দুঃখ জল হয়ে গেল বোম্বাই পৌঁছে। গাঁধীজী তাঁকে সই করা একখানা ফোটো দিলেন। তখন আর কাপ্তেনকে পায় কে ? আপনার সঙ্গে তাঁর বুঝি আলাপ হয় নি ? পরিচয় হওয়ার আড়াই সেকেণ্ডের ভিতর আপনাকে যদি সেই ছবি উনি না দেখান তবে আমি এখান থেকে ইতালি অবধি নাকে খৎ দিতে রাজী আছি। হিসেব করে দেখা গেছে ইতালির শতকরা ৮৪.২৭১৯ জন লোক সে ছবি দেখেছে।"

স্টুয়ার্ড কতটা লবণ লঙ্কা গল্পে লাগিয়েছিল জানিনে ; তবে এই কথাগুলো ঠিক যে--গান্ধীজী ঐ জাহাজেই দেশে ফিরেছিলেন— পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া থেকে আসবাব এসেছিল, গান্ধীজী এঞ্জিনরুমে গিয়েছিলেন, জাহাজের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন তাঁবুতে, আর নীচে নাবতেন উপাসনার সময়ে। অন্যলোকের মুখেও শুনেছি॥

১৯৩৪

তপঃ-শান্ত

শাস্ত্র তো মানি না আজ। হে তরুণ, তব পদাঘাত
দেশের তন্দ্রারে দিল কী রূঢ় চেতনা! ঝঞ্ঝাবাত
ঘূর্ণবায়ু দিগ্বিদিক আন্দোলিয়া কী মহাপ্রলয়
নটেশ তাণ্ডব-নৃত্য। হে তরুণ! জয়, জয়, জয়
জয় তব: অর্থহীন মূল্যহীন কে বৃথা শুধায়
কোথায় তোমার লক্ষ্য! বন্যা যবে বাঁধ ভেঙে যায়
মিথ্যা প্রশ্ন কোথা তার গতি। হে তরুণ, হে প্লাবন
নহ তো তটিনী। দু'কূলের শাস্ত্র মিথ্যা। চিরন্তন,
মৃত্যুঞ্জয়, হে নবীন, তোমার ধমনী রক্তবীণ,
অন্তহীন। পঞ্চনদে তার শাখা—সে তো নহে ক্ষীণ
সে তো নহে ধর্মে বর্ণে অবরুদ্ধ।

পঞ্চনদবাসী

কিবা হিন্দু কি মুস্‌লিম্‌ শিখ আর যত শ্বেতত্রাসী
লালকেল্লা অধিবাসী—পাইল তোমার বক্ষে স্থান;
কে বলে বাঙালী তুমি? তব রক্তপাতে অভিযান
দেশের বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল লাগি। হে অভয়,
জয় তব জয়।

প্রদোষের অন্ধকারে

নির্জীব নিদ্রায় ছিনু রুদ্ধ: নৈরাশ্যের কারাগারে
অবিশ্বাসে নিমজ্জিত। হেনকালে শুনি বজ্রশঙ্খ
হে পার্থ-সারথী লক্ষ। লৌহের কীলক পেতে অঙ্ক,
বক্ষ, ভাল, কী আদরে নিলে বরি মৃত্যু তুচ্ছ করি।
জীর্ণ এ জীবন মম পুণ্য হল বারে বারে স্মরি।

ক্ষান্ত রণ?

নহে নহে। শিবের তাণ্ডব অন্তর্হান অনুক্ষণ,
কখনো বাহিরে কভু অন্তর্মুখী। এবে শান্ত শিব
লহ সংহরিয়া নিগূঢ় ধ্যানেতে, জ্বালো অন্তর্দীপ
জ্যোতির্ময়, গহন সাধন মাঝে হও নিমজ্জিত
যে-শক্তি সঞ্চয় হল চক্রাকারে করুক প্লাবিত
বৃদ্ধি পেয়ে, গতিবেগে, পর্বত কন্দরে নদী যথা
অবরুদ্ধ, কিন্তু বহির্মুখী।

তার পর এক দিন বাহিরিবে তপঃ সাঙ্গ হলে
শৃঙ্খল হইবে মুক্ত—এ প্রলয় অভিজ্ঞতা বলে
হবে না তো উচ্ছৃঙ্খল ; অচঞ্চল দৃঢ় পদক্ষেপে
সমাহিত, রিপু শান্ত, স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন ব্যেপে
চলিবে হে ত্রিবিক্রম ! পরিবে দুর্জয় বরমালা
পূত শান্ত স্নিগ্ধ পুণ্য সর্ব-বিশ্ব-প্রেম গন্ধ ঢালা ॥

২৫।১১।১৯৪৫

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরাজ সরকার যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের লালকেল্লায় বিচার শুরু করে, তখন তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। শাহনওয়াজ-ধীলন-ভোঁসলে দিবসে বাংলার তরুণ সমাজ কলকাতায় সেদিন যে সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা দেখান তার তুলনা বিরল। অথচ সেই অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর ইংরেজ পুলিস গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। এই গুলি বর্ষণের ফলে রামেশ্বর নামে একটি তরুণ ছাত্র নিহত হন। সেদিনের ঘটনার পটভূমিকায় এই কবিতা লিখিত হয়।—প্রকাশক

মৃত্যু

বুড়ো হওয়াতে নাকি কোন সুখ নেই।

আমি কিন্তু দেখলুম, একটা মস্ত সুবিধা তাতে আছে। কোনো কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে—যেমন ধরুন প্রিয়-বিয়োগ—মনকে এই বলে চমৎকার সান্ত্বনা দেওয়া যায়—'যাক্! এটার তিক্ত স্মৃতি আর বেশীদিন বয়ে বেড়াতে হবে না। মৃত্যু তো আসন্ন।' যৌবনে দাগা খেলে তার বেদনার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। কিংবা, এই যে বললুম, প্রিয়-বিয়োগ—আমার যখন বয়স চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু'বছর বয়সে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে। তার ছ'মাস পরে ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌শন বেরোয়। তারপর যখন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তারই কল্যাণে কালাজ্বরের যমদূতগুলোকে ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় কষিয়ে ড্যাং ড্যাং করে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো তখন আমার শোক যেন আরো উথলে উঠলো। বার বার মনে পড়তে লাগলো, ঐ চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি তার জন্য কত না ডাক্তার, কবরেজ, বদ্যি, হেকিমের বাড়ি ধন্না দিয়েছিলুম। ইস্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতুম মায়ের কাছে ; শুধাতুম, 'আজ জ্বর এসেছিল ?' মা মুখটি মলিন করে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন। একটু পরে বলতেন, 'আজ আরো বেশী।'

আমি চুপ করে বারান্দায় ভাবতে বসতুম—'নাঃ, এ-কবরেজটা কোনো কর্মের নয়। কিন্তু শহরের এই তো নাম-করা শেষ কবরেজ। তবে দেখি হেকিম সায়েবকে দিয়ে কিছু হয় কিনা—'

আপনারা হয়তো ভাবছেন, 'চৌদ্দ বছরের ছেলে করবে এ-সব ডিসিশন! বাড়ির কর্তারা করছিলেন কি ?'

আসলে আমি বুঝতে পারতুম না, কর্তারা, দাদারা এমন কি মা পর্যন্ত অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, আমার ভাইটি বাঁচবে না।

তাঁরা আমাকে সে খবরটি দিতে চাননি। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দাদা আর দিদিও ঐ ব্যামোতে যায়।

ডাক্তার-কবরেজরাও আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যে তার অর্থটা আজ আমার কাছে পরিষ্কার—তখন বুঝতে পারিনি। তবু তাদের এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি দরদ ছিল বলে আসতেন, নাড়ী টিপতেন, ওষুধ দিতেন।

ঐ দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনতো সবচেয়ে বেশী—কি করে বলতে পারবো না। আমাকে দেখা মাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠতো ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করলো। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইতো না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশ মত তার নাক টিপে, তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ঐ ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।

* * *

ঠিক এক বছর পূর্বে আমার এক প্রিয়-বিয়োগ হয়। এবারেরটা নিদারুণতর। কিন্তু ঐ যে বললুম, এটা আর বেশীদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন, আমি এসব করুণ কথা পাড়ছি কেন? বিশ্বসংসার না জানুক, আমার যে ক'টি পাঠক-পাঠিকা আছেন তাঁরা জানেন আমি হাসাতে ভালোবাসি। কিন্তু 'উল্টোরথের' পাঠক-পাঠিকারা নিত্যি নিত্যি সিনেমা দেখতে যান—সেখানে করুণ দৃশ্যের পর করুণ দৃশ্য দেখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন। ভগ্নহৃদয় নায়ক কি রকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যান, আর সুস্থ হৃদয়

নায়িকা কি রকম ড্যাং ড্যাং করে বিজয়ী সপত্নের সঙ্গে ক্যাডিলিয়াক গাড়ি চড়ে হানিমুন করতে মন্টিকার্লো পানে রওয়ানা হন। আমার করুণ-কাহিনী তো তাঁদের কাছে ডাল-ভাত।

তবু আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে এ রচনা আরম্ভ করেছি মহত্তর আদর্শ নিয়ে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনো চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কি রকম বিষাদবহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে-কোন সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমন কি তীব্র শোকাবেগে কখনো কোনো অধর্মাচরণও করেননি—অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি, যা তাঁর 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষিতুল্য সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কিন্তু কখনো পা পিছলোয়নি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের আদর পাননি। কিন্তু তাঁর বয়স যখন ৭।৮ তখন তাঁর দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরী দেবীকে। বয়সে দুজনাই প্রায় সমান। কিন্তু মেয়েদের মাতৃত্ব বোধটি অল্প বয়সেই হয়ে যায় বলে তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করে দেন। এই সমবয়সী দেবরটিকে তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রকারের স্নেহ ভালোবাসা। প্রভাত মুখোর রবীন্দ্র জীবনীতে তার সবিস্তার পরিচয় পাঠক পাবেন।

এই প্রাণাধিকা বৌদিটি আত্মহত্যা করেন রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ। কী গভীর শোক তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা আত্মহত্যা

করলে পর বৃদ্ধ কবি তাঁকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন। সেটিও রবীন্দ্র জীবনীতে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক পড়ে দেখবেন। কী আশ্চর্য চরিত্রবল থাকলে মানুষ এমনতরো গভীর শোককে আপন ধ্যানলোকে শান্ত সমাহিত করে পরে রসরূপে, কাব্যরূপে নানা ছন্দে নানা গানে প্রকাশ করতে পারে,—পাঠক, শ্রোতার হৃদয় অনির্বচনীয় দুঃখে সুখে মেশানো মাধুর্যে ভরে দিতে পারে। কবির ক্ষয়ক্ষতি বাঙলা কাব্যের অজরামর সম্পদে পরিবর্তিত হল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গত হলেন, পিতা গত হলেন—এগুলো শুধু বলার জন্যে বললুম, হিসেব নিচ্ছি না।

তারপর পুরো কুড়ি বছর কাটেনি—আরম্ভ হল একটার পর একটা শোকের পালা।

প্রথমে গেলেন স্ত্রী[১]। তাঁর বয়স তখনো ত্রিশ পূর্ণ হয়নি। (বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই।) তিন কন্যা আর দুই পুত্র রেখে। সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স পনেরো, সর্বকনিষ্ঠের সাত। মাধুরীলতা ছাড়া আর সব কটি ছেলেমেয়ে মানুষ করার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর ('কাব্য পরিক্রমা'র লেখক) মাতা কবিজায়ার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পর আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা পেয়েছিলেন তেমনটি কোনো রমণী কোনো কালে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে তিনি জানেন না। তিনি বলেন, স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে তিনি নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্পর্শকাতর

১ ইনি কি রোগে গত হন জানা যায় নি। রথীন্দ্রনাথ বলতেন, 'উদরের পীড়া, খুব সম্ভব এপেণ্ডিসাইটিস।' আমি বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি সূতিকা।

কবিকে এই মৃত্যু কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবনের রহস্য শেখায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০।৪১—দেখাতো ৩০।৩১। অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি পুনরায় দারগ্রহণ করেননি।

এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বারো বছর বয়সেই পড়ল শক্ত অসুখে। যখন ধরা পড়লো, ক্ষয় রোগ, তখন কবি তাকে বাঁচাবার জন্য যে কী আপ্রাণ পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। কিছুটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন—তখনো তিনি জানতেন না, মেয়েটি কিছুদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। অসুস্থ অবস্থায়ও এই মেয়েটির প্রাণ ছিল আনন্দ-রসে চঞ্চল। পিতা-কন্যায় গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবার সময় যে মধুর সময় যাপন করেন তার কিছুটা আভাস পাঠক পাবেন 'পলাতকা'র 'ফাঁকি' কবিতাতে।

(বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে 'হাওয়া বদল করো'।

পাঠক, এই 'তখন' শব্দটির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। রোগের প্রথম অবস্থায় নয়—যখন মৃত্যু আসন্ন। এ নিদারুণ অভিজ্ঞতা ক্ষয়-রুগীর অনেক আত্মীয়-স্বজনের হয়েছে।)

দু বছরের ভিতরই দুইটি অকালমৃত্যু—অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, যেন মানুষকে নিছক পীড়া দেবার জন্য ভগবান তাকে পীড়া দিচ্ছেন। তারপর চার বছর যেতে না যেতেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে বেড়াতে যায় মুঙ্গেরে। 'সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের এক চিঠিতে লিখছেন, 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল তাহার পরে আর ফিরিল না।'

অনেকের মুখেই শুনেছি, শমীন্দ্র তার পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, সে 'আকৃতিতে প্রকৃতিতে পিতার অনুরূপ ছিল।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ দিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

. কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুত্রের স্মরণে যে কবিতা লেখেন তাতে আছে,

'বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহু বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

আবার অকালমৃত্যু! শুধু ভগবান জানেন তাঁর ভূমণ্ডল ব্যবস্থায়, ত্রিলোক-নিয়ন্ত্রণে 'ইন হিজ স্কীম অব্ থিংস' এর কি প্রয়োজন?[২] শমী আমাদের পুত্র নয়, কিন্তু এ কবিতাটি পড়ে কার না 'বুক ফাটে'? এ কবিতাটি আমি জীবনে মাত্র একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে পারিনি।

এর পর দশ বছর কাটেনি। সবজ্যেষ্ঠ সন্তান, বড় মেয়ে মাধুরীলতার হল ক্ষয়রোগ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, আমিও শুনেছি, মাধুরীর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদ্ভাব ছিল না (যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই এ বিয়ে হয়। কবি বিহারী চক্রবর্তী ছিলেন কাদম্বরী দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি)। রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা মেয়েকে দেখতে যেতেন বন্ধ গাড়িতে করে। জামাই তখন আদালতে। সমস্ত দুপুর মেয়েকে গল্প

২ রবীন্দ্রনাথও পুত্রহারা-মাতা তার কন্যার দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছেন, 'তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে / নির্বাক অপার নির্বাসনে।/ অশ্রুহীন তোমার নয়নে / অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন—/ কেন, ওগো কেন!'/—দুর্ভাগিনী, বীথিকা, পৃঃ ৩০৯।

শোনাতেন। হয়তো বা কবিতা পড়তেন। বোধহয় তারই দু'একটি 'পলাতকা' (নামকরণ অবশ্য পরে হয়) বইয়ে স্থান পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কবি কোচম্যানকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। আমি শুনেছি, এই মেয়ে নাকি বড় উৎসুক আগ্রহে পিতার লেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ভাগলপুরে, কলকাতায়।

বহু বহু বৎসর পর এঁর সখী ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী লেখেন, (উভয়ের শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর—বোধহয় সেইসূত্রে পরিচয় ও সৈখ্য) মেয়ের স্মরণে কবির চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বোধহয় 'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় এ মেয়ের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বেই বলেছি, মাধুরীলতার রোগশয্যায় কবি তাঁকে গল্প বলতেন। এবং শেষের দিকে বোধহয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে এ মেয়েও বাঁচবে না। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এঁরা সব তাঁর মায়ার বন্ধন কেটে সময় হবার বহু পূর্বেই পালিয়ে যাচ্ছেন—এঁরা সব 'পলাতকা'। তাই মাধুরীলতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বেরল 'পলাতকা'। এ বইয়ের উপর মাধুরী, রেণুকা, শমী তিন জনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। আরো হয়তো কয়েক জনের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা হয়তো তাঁর পরিবারের কেউ নয় তাই তাঁদের ঠিক চেনা যায় না।

'পলাতকা'র সর্বশেষের কবিতাটিতে আছে,—কবিতাটির নাম 'শেষ প্রতিষ্ঠা'—

'এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে, গেছে চলে"।
তবু রাখি বলে

বোলো না 'সে নাই'।

*　　　　*　　　　*

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে "আছে" "নাই" পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।'

এই কবিতাটি কবির সর্ব পলাতকার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, 'আছে' ও 'নাই' দুটোই একসঙ্গে অস্তিত্ব রাখে কি প্রকারে? কবি এর উত্তর দিলেন—অবশ্য সে উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হবেন কি না জানিনে—তাঁর জীবনের শেষ শোকের সময়।

'পলাতকা'র সব কটি পালিয়ে যাবার পর কবির রইলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা। এই মীরাদি'র একটি পুত্র ও কন্যা। এ নাতীটিকে রবীন্দ্রনাথ যে কী রকম গভীর ভালবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সে কথা ঐ সময়ের আশ্রমবাসী সবাই জানে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি—নীতু যদিও আমার চেয়ে বছর নয়েকের ছোট ছিল তবু হস্টেলে সে প্রায়ই আমার ঘরে আসতো। ভারী প্রিয়দর্শন ছিল সে। মাঝে মাঝে ফিনফিনে ধুতি-কুর্তা পরে এলে মানাতো চমৎকার—আমরা শুধাতুম, কে সাজিয়ে দিল রে?

সে উত্তর না দিয়ে শুধু মিট্ মিট্ করে হাসতো। চট্টগ্রামের জীতেন হোড় বলতো, 'নিশ্চয়ই দাদামশাই।' আমি বলতুম, 'মা'। (আশা করি, এ-লেখাটি মীরাদি বা তাঁর মেয়ে 'বুড়ী'র চোখে পড়বে না—তাঁদের শোক জাগাতে আমার কতখানি অনিচ্ছা সে কথা অন্তর্যামী জানেন।) সেই নীতু গেল ইয়োরোপে। ক্ষয়রোগে মারা গেল ১৯।২০ বছর বয়সে। এই শেষ শোকের বর্ণনা দিতে কারোরই ইচ্ছা হবে না। কবির বয়স তখন ৭১। একে নিজের শোক, তার উপর কন্যা—পুত্রহারা মাতার শোক।

শুধু একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করি—শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বরানগরে মহলানবিশদের সঙ্গে। বন্ধু এণ্ডরুজ সায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, নীতুর শরীর আগের চেয়ে একটু ভালো।

'পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম, ছ'দিন (দু'দিন ?) আগে ৭ই আগষ্ট জার্মাণীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।'

এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে ?

'শেষে স্থির হল খড়দায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে টেলিফোন করে আনিয়ে আমরা চারজনে একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভাল আছে, না ?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো ? কাল এণ্ডরুজও আমাকে লিখেছেন যে, নীতু অনেকটা ভাল আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।"[৩] রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভাল নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতন চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে। আমি আজ

---

৩ এর আগের দিন রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা মহলানবিশকেও বলেন, 'কাল এণ্ডরুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি লিখেছেন, ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহেব লিখেছেন, নীতুকে হয়তো শীগ্‌গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।—তা হলে ভাবছি তাকে একটা কোনো ভালো জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেবো। ভাওয়ালি কি কোনো পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে।' পৃঃ ২৮।

গিয়ে কাল যাবো, তুই আমার সঙ্গে যাস"।'

নীতুর মা জর্মনি গিয়েছিলেন পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি দিন বোম্বাই পৌঁছবেন, তার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। তাতে সেই 'আছে' ও 'নাই'-য়ের উত্তর আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল,[৪] সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?'

এই সেই মূল কথা। সে নেই কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে সে 'আছে'। বার বার নমস্কার করি গুরুকে, গুরুদেবকে। বার বার অদৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে তিনি কাতর হয়েছেন, কিন্তু কখনও পরাজয় স্বীকার করেন নি।

এবং পাঠক-পাঠিকাদের উপদেশ দি, প্রিয়-বিয়োগ—এমন কি প্রিয়-বিচ্ছেদ—হলে তাঁরা যেন উপরে বর্ণিত এই চিঠিখানা পড়েন। এ চিঠি মুক্তপুরুষের লেখা চিঠি নয়। কারণ গীতায় আছে মুক্তপুরুষ 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন।' রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতই কাতর হতেন—হয়তো বা আরো বেশী; কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী—কিন্তু তিনি

৪ এর মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং আরো বলেছি মাতা ও পুত্র যান একই দিনে, এবং আশ্চর্য, দাদামশাই ও নাতী যান একই দিনে। (২২ শ্রাবণ)।

পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই। এ-চিঠি একজনকেও পরাজয়-স্বীকৃতি থেকে নিষ্কৃতি দেয় তবে অমৃতলোকে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হবেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি সিনেমা দেখতে যাও। সেখানে যদি কোনো ছবিতে তোমার হীরোর জীবনে পরপর এতগুলো শোকাবহ ঘটনা ঘটতো তবে তুমি বলতে, 'এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি। এ যে অত্যন্ত অবাস্তব, আন্‌রিয়ালিস্টিক।'

তাই বটে। যা জীবনে বাস্তব তা হয়ে যায় সিনেমায় অবাস্তব আশ্চর্য। আমার কাছে আবার সিনেমাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকে

তাই সিনেমাওলাদের কাছেই রবীন্দ্র জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অধ্যায় তুলে ধরলুম। নইলে 'রবীন্দ্রনাথের শোক ও কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি' এ জাতীয় ডক্টরেট থিসিস লেখবার বয়স আমার গেছে। আর তাই এ 'রম্যরচনাটি' আরম্ভ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারণ আমার জীবন আর তোমাদের পাঁচজনের জীবনের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। তফাৎ যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু, যে তোমরা মনোবেদনা গুছিয়ে বলতে পার না ব'লে গুমরে গুমরে মরো বেশী কিন্তু তোমাদের এই বলে সান্ত্বনা জানাই, যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয় ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে। আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায় সেদিন যতই গুছিয়ে বলো না কেন, সে শুনবে না। কাজেই না বলতে-পারাটা তোমাকে গুছিয়ে-বলতে-পারার বিড়ম্বনা থেকে অন্তত বাঁচাবে॥

—শেষ—